

ইসলামী উপন্যাস

বিবিজান হুজুরের হারানো বিদ্যা

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

জিলহজ্জ-১৪৩৮ হিজরী
সেপ্টেম্বর-২০১৭ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

bestkitab.weebly.com

almunirabdullah@gmail.com

মূল্যঃ ৬৫ টাকা।

সূচিপত্র

বিবিজান হুজুরের হারানো বিদ্যা.....	1
এক.....	4
দুই.....	21
তিন.....	35
চার.....	45
পাঁচ.....	65
পরিশিষ্ট.....	72

এক.

ইমাম সাহেব পান চিবানো বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ছেলেটির দিকে। তিনি তাকে চেনেন। তার বাবা মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি। ইমাম সাহেবের চাকরিটা বলতে গেলে তারই হাতে। একারণেই ছেলেটার সাথে খুব মাফ-যোখ করে কথা বলতে হচ্ছে। এশার নামাজের পর মিয়া বাড়ি থেকে চার স্তরের টিফিন বাটি ভর্তি খাবার এসেছিল। একাই সে গুলো সাবাড় করে সবে একটা পান মুখে দিয়ে নিরিবিলিতে বসেছেন অমনি এসে হাজির হয়েছে ছেলেটা। অন্য কেউ হলে ধমক দিয়ে বিদায় করে দিতেন। সাধারণ মানুষের সাথে ধমকের স্বরে কথা বলায় তার অভ্যাস। তাছাড়া কোনো কিছু খাবার সময় তিনি কারও ডিস্টার্ব একে বারেই সহ্য করেন না। কিন্তু এ হলো সেক্রেটারির ছেলে। তাকে ধমক দেওয়া যাবে না। উল্টো সে যদি ধমক দেয় তবে মুখ বুঝে সহ্য করতে হবে। তার সামনে ইমাম সাহেব তাই যথেষ্ট আদব রক্ষা করে চলছেন। এমনকি তার সামনে পান চিবানো বেয়াদবী হতে পারে এমন মনে করে তিনি পান চিবানো বাহ্যত বন্ধ রেখেছেন। ভিতরে ভিতরে অবশ্য যথা সম্ভব চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে ছেলেটা এসে পর্যন্ত এমন সব ভয়ানক গল্প-গুজব করছে যা শুনে ইমাম সাহেবের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। বিগত দু-দশ বছরের মধ্যে আশেপাশের এলাকায় যে সব খুন হয়েছে, তা কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে সে। এমনকি নিহত ব্যক্তি মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে কেমন করেছিলো বা কি বলেছিলো বর্ণনাতে তাও বাদ পড়ছে না। যেমন, কেউ হয়তো মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে কুক করে শব্দ করে উঠেছিলো, কেউ আবার ফ্যাস করে নিশ্বাস ফেলেছিলো ইত্যাদি। একজনের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে ছেলেটা বলল, তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসছিলো। যেভাবে আপনার মুখ দিয়ে এখন পানের পিক বের হয়ে আসছে। কি যে বিভৎস লাগছিলো বলে খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলো সে। ইমাম সাহেব হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আসলেই তার মুখ ফসকে পানের পিক বের হয়ে এসেছে। গল্প শুনতে শুনতে একটু অসতর্ক হয়েছেন বলেই এমন হয়েছে। তাই বলে তার সামনেই তার মুখটাকে বিভৎস বলে আখ্যায়িত করা নিঃসন্দেহে অনুচিত, এটা মারাত্মক অপমান। তবুও তিনি তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তিনি ভাবছেন, ঐ লোকটার কথা, মৃত্যুর সময় যার মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে এসেছিলো। তাকে কেমন বিভৎস লাগছিলো সেটা ভেবে তিনি আতঙ্কে আরও একবার

শিওরে উঠলেন। অন্য একটা বিষয় মনে হতেই তার আতংক বহু গুনে বেড়ে গেলো। বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে এই ছেলেটা স্বয়ং খুন করেছে। অথবা কমপক্ষে খুনির পাশে দাড়িয়ে খুব কাছ থেকে খুনগুলো নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। অর্থাৎ হয়তো সে খুনি নতুবা খুনের সহযোগী। কথাটা মনে হতেই ইমাম সাহেব আতকে উঠলেন। তবে কি তিনি একজন পেশাদার খুনির সামনে বসে আছেন। আদবের পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন তিনি। মনে হচ্ছে সামান্য ভুলত্রুটি হলেই ছেলেটা হয়তো তাকেই খুন করে ফেলবে।

কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে ছেলেটা একটা দড়ির মতো জিনিস বের করলো তার পকেট থেকে। সেদিকে চোখ রেখে ইমাম সাহেবের শরীরের সবগুলো লোম ব্যাণ্ডের মত লাফিয়ে উঠলো। প্রতিটা গল্লেই ছেলেটা এমন একটা দড়ির কথা বলেছে। যা গলায় পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে লোক গুলোকে হত্যা করা হয়েছে। আতঙ্কে শিওরে উঠে ইমাম সাহেব বললেন,

— এ দড়িই কি সেই মারাত্মক অস্ত্র যা দ্বারা খুন গুলো করা হয়েছে?

ছেলেটা অভয় দিয়ে বলল,

— আরে না না। খুনের অস্ত্র আমার কাছে কেনো থাকবে? এটা একটা সাধারণ দড়ি। এই যে ছুয়ে দেখুন না।

ছেলেটার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইমাম সাহেব দড়িটা ছুয়েই দেখলেন। দড়িটা মোটেও সাধারণ দড়ি নয়। ভীষণ শক্ত আর তেলা। তাছাড়া তাতে আঠার মতো কি সব যেনো লেগে রয়েছে। ইমাম সাহেবের হাতেও সে সব বস্তু লেগে গেলো। নিজের হাতটা দেখিয়ে তিনি বললেন,

— এসব কি?

ছেলেটা বলল,

— ও কিছু না, রক্ত।

রক্তের কথা শুনে ইমাম সাহেবের শরীরের রক্ত যেনো হিম হয়ে গেলো।

— রক্ত মানে?

— রক্ত মানে রক্ত। ঐ যে লাল লাল দেখায়...

— আহা সেতো বুঝলাম। কিন্তু কিসের রক্ত এ?

ছেলেটা হালকা হেসে বলল,

— তা বলা যাবে না। বললে আপনি ভীষণ ভয় পাবেন।

বললে যতটুকু ভয় পেতেন না বলাতে ইমাম সাহেব ভয় পেলেন তার চেয়ে বহুগুনে বেশি। তিনি সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলেন। তার মনে প্রবল ধারণা হলো এই ছেলেটা পেশাদার খুনি ছাড়া কিছু নয়। আর এই বিচিত্র দর্শন দড়িটাই তার মারনাস্ত্র। ভয়ে তিনি পুরা শিটকে গেলেন। তবে মুখে কিছুই বললেন না।

ছেলেটা যেনো এমন সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলো। যখন দেখলো ইমাম সাহেব ভয়ে আধা মরা হয়ে গেছেন তখন বলল,

— মা-চাচীদের ওয়াজ তো খুবই হলো। বোন আর বউদের ওয়াজ শুরু হবে কবে থেকে?

ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— ওয়াজের আবার মা-বোন কি? ওয়াজ তো ওয়াজই।

ছেলেটা মুচকি হেসে বলল,

— উহু, সব ওয়াজ তো আর ওয়াজ নয়। ওয়াজের মধ্যে কিছু আছে কেওয়াজ আবার কিছু আছে তোয়াজ।

ইমাম সাহেব কিছুটা বুঝেও না বোঝার ভান করে বললেন,

— মানে?

— মানে খুব সহজ। কেওয়াজ মানে হলো, দলীল প্রামান ছাড়াই ভুল-ভাল বকা। আর তোয়াজ মানে হলো সমাজের লোকের মনমত কথা বলা।

ইমাম সাহেব অভিমানের স্বরে বললেন,

— আপনি বলতে চান আমরা ওয়াজের বদলে কেবলই মানুষের তোয়াজ করি?

ছেলেটা বলল,

— না। কেবলই তোয়াজ করেন তা নয়। মাঝে মাঝে কেওয়াজও করে থাকেন। অর্থাৎ দলীল প্রমাণ ছাড়া উদ্ভট সব কথাবার্তা বলেন।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেব ভেতরে ভেতরে ভীষণ রাগ অনুভব করলেন। তবে মুখে কিছুই প্রকাশ করলেন না। সেক্রেটারি সাহেবের এই গুন্ডা ছেলেটার সামনে কোনো কথা বলতে তার সাহস হচ্ছে না। ভেতরের রাগ ভেতরে চেপে রেখেই তিনি বললেন,

— আমরা দলীল প্রমাণ ছাড়া কথা বলি এটা কি আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?

কথাটা শুনে বেশ কিছুক্ষন নিরব থেকে ছেলেটা বলল,

— ওখানেই তো হয়েছে সমস্যা! আমরা সাধারণ মানুষ দলীল প্রমাণ বুঝি না। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক তা প্রমাণ করতে পারি না। এই সুযোগে আপনারা যা খুশি বলে যান। কি আর করি বলেন। কিছু করার নেই।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেব কিছুটা সাহস পেলেন। বিরোধী পক্ষ যখন নিজে মুখেই স্বীকার করছে কিছু করার নেই তখন ভয় পাওয়ার আসলেই কোনো কারণ নেই। হালকা হেসে তিনি বললেন,

— প্রমাণ ছাড়া আন্দাজে কেনো বলছেন আমরা দলীল প্রমাণ ছাড়া কথা বলি?

কথাটা শুনে ছেলেটা যেনো একটু রেগে গেলো। চোখ দুটি গোল্লা গোল্লা করে বলল,

— আপনাদের মত আন্দাজে কথা আমরা বলি না। আমরা যেটা বলি ভেবে চিন্তেই বলি।

ইমাম সাহেব কিছুটা দমে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, লোকটা কি পাগল নাকি? এই বলছে আমরা সাধারণ মানুষ। দলীল প্রমাণের কিছু বুঝি না। আবার এই বলছে আমরা আন্দাজে কথা বলি না। ব্যাপারটা কি? তবে মুখে বললেন,

— তাতো বটেই। আপনারা জ্ঞানী গুণী ও সম্মানী মানুষ। আপনারা আন্দাজে কথা বলতে যাবেন কেনো? ছেলেটা ধমকের স্বরে বলল,

— আবার শুরু হলো তোয়াজ।

ধমক শুনে ইমাম সাহেব নিরব হয়ে মুখটা পাংশু করে বসে থাকলেন। নিরবতা ভেঙে ছেলেটা বলল,

— সে যাই হোক। এবার আসল কথা বলি।

ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হতে দেখে ইমাম সাহেব খুশি হলেন। হাসি মুখে বললেন,

— জি বলুন।

রাগত স্বরে লোকটা বলে উঠলো,

— জানেন আপনি আমার কি ক্ষতি করেছেন?

কথা শুনে ইমাম সাহেব যেনো আকাশ থেকে পড়লেন। আমতা আমতা করে বললেন,

— আমি আবার আপনার কি ক্ষতি করলাম?

গরম মেজাজ জোর করে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে ছেলেটা বলল,

— আমার বউটা বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেবের মনে মনে হাসি পেলো। কিন্তু মুখে বললেন,

— কি সর্বনাশ! কবে?

— এই কয়েকদিন হলো।

ইমাম সাহেব আবার তোয়াজ শুরু করলেন।

— অত্যন্ত বেয়াদব মেয়ে। একবারে পোড়া কপালী। স্বামীকে ছেড়ে যে পালিয়ে যায় সে কি মানুষ নাকি?

ইত্যাদি নানা কথা বলতে লাগলেন। কথাগুলো শুনে ছেলেটার রাগ বাড়তে থাকে। কিন্তু সে তার রাগ তার বউয়ের উপর নাকি ইমাম সাহেবের উপর তা বোঝা যায় না। হঠাৎ যেনো রাগের বিস্ফোরন ঘটিয়ে চৌঁচিয়ে বলে,

— এর জন্য আপনিই দায়ী।

চোখ মুখ দিয়ে তখন যেনো তার আগুন ঝরছে। ইমাম সাহেব কথা শুনে একই সাথে

ভয়ও পেলেন, অবাকও হলেন। তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই যেনো বের হয় না।

— আমি করেছি? ছি ছি আপনি এ কি কথা বলছেন। নাউযুবিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ। ইমাম হয়ে আমি কি পরের বউ ভাগিয়ে নিয়ে যাব? এ কেমন কথা।

লোকটা চোখ নাচিয়ে বলে,

— ইমামরা পরের বউ ভাগিয়ে নিয়ে যায় না?

ইমাম সাহেব বিষয়টা অস্বীকার করতে পারলেন না। তবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন,

— কারও বউ ভাগিয়ে নিয়ে গেলে ইমামও তো তার সাথে ভেগে যায়, তাই না? কিন্তু এই দেখুন না আমি বহাল তব্বিতে আপনাদের এলাকায় টিকে রয়েছি। আমি তো ভেগে যায়নি। তাহলে আমি কিভাবে আপনার বউ ভাগিয়ে নিয়ে গেলাম।

ইমাম সাহেবের কথাটা শেষ হতেই ইমাম সাহেবকে অবাক করে দিয়ে লোকটা হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর বলল,

— বেশ সুন্দর যুক্তি দিলেন তো! বিপদে পড়লে আপনাদের মাথা দেখছি ভালোই কাজ করে।

তার কথা শুনে খুশি হবেন কি বেজার হবেন ইমাম সাহেব তা বুঝে উঠতে পারলেন না। কেবল বিনীতভাবে বললেন,

— এখন তো বুঝতে পারছেন আমি আপনার বউ ভাগিয়ে নিয়ে যায় নি।

হাসি থামিয়ে লোকটা গরম গলায় বলল,

— সেটা আমি আগেই বুঝেছি। আমার বউ আর যাই করুক বাড়ি বাড়ি চেয়ে খাওয়া লোকের হাত ধরে পালাবে না।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেবের রেগে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তিনি খুশি হলেন। হেসে লাল দাঁত গুলো বের করে বললেন,

— ঠিকই তো। ভাবি সাহেবেরও তো একটা রুচি আছে। নাকি?

তারপর বিড়বিড় করে বললেন,

— তাহলে তিনি কার হাত ধরে ভেগেছেন?

লোকটা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

— তার বাবার হাত ধরে।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেবের চোখ কপালে উঠে গেলো। বাবার হাত ধরে কোনো মেয়ে ভেগে যায় এমন কথা তিনি জীবনে শোনেননি। এতে তো ঘরে ঘরে আত্মীয় হয়ে যায়। ভাগতেই যদি হয় তবে অন্য জনের হাত ধরে ভাগতে হবে। তাতে একটা আত্মীয় বাড়বে। এত কথা তিনি লোকটাকে বলতে পারলেন না। কেবল বড় মাপের একটা নাউয়ুবিল্লাহ পাঠ করে বললেন,

— এ কেমন ব্যাপার?

লোকটা বলল,

— সহজ ব্যাপার। তবে আপনার না জানলেও চলবে।

এতক্ষণে ইমাম সাহেবের ধড়ে প্রান ফিরে এলো। বড় একটা বদনামের হাত থেকে তিনি বেঁচে গেলেন। তবে তার মনে একটা প্রশ্ন খচখচ করতে থাকে। ব্যাপার যখন এই তখন এর মধ্যে তার নামে দোষ দেওয়ার হেতুটা কি? লোকটা যেনো তার মনের কথা বুঝতে পারলো। মেঘ গুড় গুড় মেজাজে বলল,

— শোনা যাচ্ছে শিষ্যই আমার স্ত্রী আমার নামে ডিভোর্সনামা পাঠাবে। আমি ঠিক করেছি তখন আপনার বউটা ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করব। ইমাম সাহেবের মুখটা আমাবশ্যার রাতের মত অন্ধকার হয়ে গেলো। বারবার তাকে টেনে এনে কেনো যে অপমান করা হচ্ছে সেটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। মুখটা পাংশু করে তিনি বললেন,

— আমার কি দোষ?

দাঁতে দাঁত পিষে লোকটা বলে উঠলো,

— আপনিই তো লাটের গুরু।

লাটের গুরু শব্দটা ইমাম সাহেব এর আগেই বহুবার শুনেছে। কিন্তু এখনও ভালো মত

এর মানে বোঝেন না। কেবল বোঝেন, লাটের গুরু মানে প্রধান আসামী। কিন্তু এই লোকটার পারিবারিক বিষয়ে তিনি কেনো প্রধান আসামী হবেন তা কিছুতেই বুঝতে পারেন না। বিনীত ভাবে তিনি বলেন,

— দয়া করে ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো।

কথাটা শুনে প্রথমেই লোকটা দাঁত কিড়মিড় করে উঠে। তারপর বলে,

— কয়েকমাস আগে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। মনে আছে?

ইমাম সাহেবের ঘটনাটা ভালোমত মনে পড়ে না। অথবা তিনি মনে করতে চান না। লোকটা তখন ঠান্ডা মেজাজে পুরা ঘটনাটা তাকে খুলে বলে।

— বিয়ের পর থেকেই আমার স্ত্রীর সাথে আমার মা-বাবার বনী-বনা হয়না। সারাক্ষণ জাত আর বংশ তুলে গালাগালি করে। ছোটলোকের মেয়ে, বেজাতি, বেহায়া ইত্যাদি। আমার স্ত্রী এমনিতে নরম স্বভাবের। তবে কখনও কখনও এর প্রতিবাদে দুই একটা কথা বলে। তৎক্ষণাৎ বেধে যায় তুলকালাম কান্ড। আমার মা-বোনেরা মিলে তার সাথে তুমুল ঝগড়া করে। দুনিয়ার এমন কোনো নিচু ভাষা নেই যা তারা তার ব্যাপারে প্রয়োগ করে না। তাদের সাথে কথা বলে আমার স্ত্রী পেরে ওঠে না। কেবলই হাউ মাউ করে কান্নাকাটি করে। বাবা বাড়ি এসে সব শুনে আমার স্ত্রীকে ডেকে বলেন,

— শাশুড়ি হলো গুরুজন। তার কথার উপর কথা বলা তোমার অবশ্যই অন্যায় হয়েছে। যাও এখনই গিয়ে শাশুড়ির কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

আমার স্ত্রী বলে,

— আমি দোষ করিনি। আমি কেনো ক্ষমা চাবো?

বাবা রেগে গিয়ে বলেন,

— বেয়াদব মেয়ে। গুরুজনের কথার অবাধ্য হও।

ইমাম সাহেব পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারেন। বুঝতে পারেন বিবাদটা সেক্রেটারি আর তার ছেলে-বউয়ের মাঝে। এখন কোন পক্ষ অবলম্বন করা উচিত সেটাও তিনি বিলক্ষণ বুঝে ফেলেন। তারপর বলেন,

— ঠিকই তো। শ্বশুর-শাশুড়ি বাবা মায়ের সমান। তাদের অবাধ্য হওয়া ভীষণ অন্যায়।
সেক্রেটারী সাহেব ঠিকই বলেছেন।

ভেতরে ভেতরে রাগ ফুসে উঠলেও তা চেপে রেখে লোকটা বলে,

— গতবারও আপনি এই একই কথা বলেছিলেন।

কথাটা শুনে মুচকি হেসে ইমাম সাহেব বলেন,

— আরে ভাই, মুমিনের কথা কি আর দুরকম হয়?

লোকটা খুশি হওয়ার ভান করে বলে,

— তাই তো দেখছি।

তাকে খুশি হতে দেখে ইমাম সাহেব সাহস পেয়ে যান। অতি উৎসাহী হয়ে বলেন,

— হিন্দুরা শ্বশুর শাশুড়িকে দেবতার মত মান্য করে। আর আমরা তো মুসলমান।

তাহলে আমাদের কতটা মান্য করা উচিত ভেবে দেখুন। লোকটা মুচকি হেসে বলে,

— এ কথাটাও আপনি গতবার বলেছিলেন।

ইমাম সাহেব আরও বেশি খুশি হয়ে বলেন,

— ঐ যে বললাম, মুমিনের এক কথা। আমার কোনো কথাই আপনি দুরকম পাবেন না। সে দুমাস পরে হোক আর দুবছর।

নিজের প্রশংসায় ইমাম সাহেব আরও কিছু কথা হয়তো বলতেন। কিন্তু লোকটা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

— আমার কথাটা আগে শেষ করি।

ইমাম সাহেব কিছুটা বিব্রত হয়ে বললেন,

— ঠিক আছে বলুন।

— আমার স্ত্রী আমার নিকট প্রায়ই আমার মা-বোনদের সম্পর্কে অভিযোগ করতো।
আমাকে আলাদা হতে বলতো।

ইমাম সাহেব আর সহ্য করতে পারলেন না। কথার মাঝখানে বলে উঠলেন,

- ছি! ছি! এ কেমন কথা। কোনো মুমিন বান্দা কি কখনও বাবা-মার সাথে আলাদা হয়?
ছি! ছি!

ছেলেটা ঞ্চ কুচকে বলে,

— এটা কি হারাম।

ইমাম সাহেব সাথে সাথেই বলে উঠলেন,

— হারাম মানে। একি যা তা হারাম!

— হারাম হওয়ার কোনো দলীল আছে? থাকলে বলুন তো।

ইমাম সাহেব আমতা আমতা করে বললেন,

— দলীল তো তেমন একটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তবে বাবা-মার সাথে আলাদা হলে সমাজের দশজন লোক কি বলবে বলুন তো। মানুষ কি আর মানুষ বলবে।

লোকটা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম করে বলল,

— তার মানে কোরআন-হাদীসের দলীল এখানে নেই। কেবল সমাজ ঠেকানোই উদ্দেশ্য তাইতো?

ইমাম সাহেব কি বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। কিছু একটা দলীল উল্লেখ না করলে এখানে মান রক্ষা হচ্ছে না দেখে তিনি দলীল খুঁজতে থাকেন। পড়াশুনা তিনি একেবারে কম করেন তা নয়। তবে সমস্যা হলো যখন যদিকে তার স্বার্থ থাকে কেবল সেই পক্ষের দলীল প্রমাণ গুলো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে আর বাকি গুলো মন থেকে হারিয়ে যায়। এখন তিনি সংসার আলাদা করার বিপক্ষে কথা বলছেন। একটু খুজা-খুজি করলে এ ব্যাপারে কোনো একটা দলীল তার পেয়ে যাওয়ারই কথা। তিনি তাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শেষ-মেশ পেয়েও গেলেন একটা। একগাল হেসে বললেন,

— দেখুন, যুদ্ধে কাফিরদের স্ত্রী ও সন্তান মুসলমানদের হাতে বন্দি হতো। তাদের দাস-দাসী হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হতো। হাদীসে বলা হয়েছে, বন্টন করার সময় মা-ছেলে অথবা ভাই-ভাইয়ে যেনো আলাদা না করা হয়। এটা হলো কাফিরদের

স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাপারে। তাহলে মুসলিম বাবা-মা, ভাই-বোনদের সাথে আলাদা হওয়া কতটা নিকৃষ্ট তা ভেবে দেখুন।

দলীল শুনে লোকটা ভীষন অবাক হলো। স্বার্থের প্রয়োজনে কোন দিককার পানি হজুররা কোন দিকে গড়িয়ে দিতে পারে এ থেকে তা স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। বোঝাই যাচ্ছে এখানে একটা গোজামিল রয়েছে। কিন্তু সেটা কি তা সে ধরতে পারে না। এখন সে ধরতে চায়ও না। কেবল শুনতে চায়। পরে ভুল ঠিক যাচায় করার একটা পস্থা সে ঠিক বের করে নেবে। দলীল পেয়ে খুশি হওয়ার ভান করে তাই সে বলল,

— চমৎকার দলীল তো।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেব ভীষণ খুশি হয়ে গেলেন। একগাল হেসে বললেন,

— এবার ভাবুন, বাবা-মা, ভাইবোনদের সাথে যে স্ত্রী স্বামীর সংসার আলাদা করতে চায় সে কি মানুষ না শয়তান।

লোকটা প্রথমে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ে। তারপর বলে,

— আমিও স্ত্রীকে বলেছি, আমি মিয়া বাড়ির ছেলে। বাবা-মার অবাধ্য হয়ে সংসার আলাদা করলে সমাজের লোক কি বলবে। আমার পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়।

ইমাম সাহেব উচু স্বরে বললেন,

— মাশায়াল্লাহ। আপনি অতি উত্তম কথা বলেছেন। এটাই হলো পাকা ঈমানদারের কথা। স্ত্রী লোকের শয়তানী কথায় তারা প্রতারিত হয় না।

তিনি আরও কিছু বলতেন। কিন্তু লোকটা হাত উচু করে তাকে থামিয়ে বলল,

— আমার মুখে এমন কথা শুনে মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী বলতো, তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো।

কথাটা শনার সাথে সাথে ইমাম সাহেব চিৎকার করে উঠলেন।

— নাউযুবিল্লাহ। আসতাগফিরুল্লাহ। কেমন শয়তানী কথা দেখেছেন? রসূল বলেছেন, যে আত্মহত্যা করে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

এতক্ষণে লোকটার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলো। হালকা বিরক্ত হয়ে বলল,

— আচ্ছা, বেটার বউদের পক্ষে রসুল কিছুই বলেননি? কমপক্ষে অত্যাচারের মাত্রা অধিক হলে আত্মহত্যার অনুমতিও কি নেই?

কথাটা শুনে ইমাম সাহেব যেন বেশ একটু অবাক হলেন। হালকা হেসে বললেন,

— আত্মহত্যার আবার অনুমতি! এমন হাদীস আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

লোকটা বলে,

— শাশুড়ির উপর বেটার বউ কোনো অন্যায-অবিচার করলে তার বিরুদ্ধে তো মেলা মেলা হাদীস আর সমাজের দশজনের দশরকম মন্তব্য শুনতে পাওয়া যায়। হুজুররাও তার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেন। সেটা নিঃসন্দেহে ভালো জিনিস। কিন্তু শাশুড়িরা যখন বেটার বউদের উপর অত্যাচার করে তখন সমাজের লোকও কোনো উচ্চ-বাচ্চ করে না, হুজুররাও কোনো হাদীস বলে না। এর কারণ কি?

ইমাম সাহেব সহজভাবে বলেন,

— কারণ আবার কি। এ ব্যাপারে হাদীস নেই। তাই বলি না।

লোকটা অবাক হয়ে বলে,

— এ ব্যাপারে কোনো হাদীস নেই!

ইমাম সাহেব এখানে অবাক হওয়ার কারণ খুঁজে পেলেন না। তিনি বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করেন।

— দেখুন বাবা-মা যা করবে তার বিরুদ্ধে কিছু করার কথা কি হাদীসে থাকতে পারে? এই এক যুক্তিতেই লোকটার বুঝে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সে বুঝতে পারে না। আপত্তি করে বলে,

— বাবা-মা জুলুম করলেও তার প্রতিবাদ করার কথা হাদীসে নেই?

ইমাম সাহেব একরকম ধমক দিয়েই বললেন,

— আরে ভাই, বাবা-মা যাই করুক তার বিরুদ্ধে টু শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, বাবা মার সামনে উফ শব্দ উচ্চারণ করবে না।

কথাটা শুনে লোকটা যেনো বিম মেরে যায়। তারপর বলে,

— তাহলে কুরআন হাদীস সবই শাশুড়িদের পক্ষে, বেটার বউদের পক্ষে কোনো হাদীস নেই?

ইমাম সাহেব মাথা নেড়ে বলেন,

— আমার তো মনে পড়ছে না।

লোকটা মনে মনে বলে,

— মনে তোমার ঠিকই পড়বে। যখন স্বার্থে আঘাত আসবে তখন তোমার মুখ দিয়ে হড়হড় করে ওসব হাদীস বের হবে। সে ফন্দি আমার আগেই ঠিক করা আছে। সময় হলেই টের পাবে।

লোকটাকে নিরব দেখে ইমাম সাহেব মনে করলেন, সে সব বুঝে গেছে। মুচকি হেসে বললেন,

— তাহলে সবই তো বুঝলেন। এখন বাড়ি চলে যান। রাত তো অনেক হলো। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছে।

লোকটা ভারী গলায় বলল,

— গল্পের শেষই তো শুনলেন না।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেবের হাস্যজ্জল মুখটা আবারও ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তবুও ভদ্রতা করে বললেন,

— ও হ্যাঁ। তাই তো। বলুন শুনি আপনার গল্প।

লোকটা বলল,

— তারপর আর কি? একদিন তার বাবা আসল সমাধান করার জন্য। দুই পরিবার আলোচনায় বসল। আমার মা-বোনেরা শত সহস্র অভিযোগ করলো তার বিরুদ্ধে। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে, গোসলের সময় শ্বশুর-শাশুড়িকে নাম মাত্র পানি চেপে দিয়ে চলে আসে, সেখানে গামছা নিয়ে দাড়িয়ে থাকে না, শ্বশুর-শাশুড়ির ভাতটা কোনো মতে বেড়ে দেয়। কিন্তু খাওয়ার সময় পাখা নিয়ে বাতাস করে না, শ্বশুর-শাশুড়ি

ও দেবর-ননদদের কাপড়-চোপড় কাচে বটে তবে ভক্তি দিয়ে কাচে না। তাই ভালোমত পরিষ্কার হয় না, মাঝে মাঝে দিনের বেলা স্বামী নিয়ে ঘরে শুয়ে থাকে ইত্যাদি নানা অভিযোগ তোলা হলো তার বিরুদ্ধে। আমার শ্বশুর বিচক্ষণ মানুষ। তিনি বুঝতে পারলেন, সংসারের যত কাজ তার মেয়ের উপর চাপানো হয়েছে তা সম্পাদন করাই অসম্ভব ব্যাপার। আর নির্ভুল ও নিখুত ভাবে সম্পাদন করা তো অলিক কল্পনা। অতএব এদিক থেকে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। এ সমস্যা সমাধানের উপায় একটাই। তাহলো মেয়েটাকে এসব গুরুদায়িত্বের ভার থেকে মুক্ত করা। এর দুটি উপায় আছে। এক. মেয়ে-জামায়ের সংসার আলাদা করা। দুই. মেয়ে-জামায়ের বিয়েটাই ভেঙ্গে দেওয়া। প্রথমটা তো হারাম যেমন আপনি বললেন। তাই আমার শ্বশুর এখন দ্বিতীয়টি করা যায় কিনা সে চেষ্টায় আছেন। তবে তিনি প্রথমে আগের সমাধানটি করতে চেয়েছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

— বাবা স্বপন, সুমির ব্যাপারে তোমার কি কোনো অভিযোগ আছে?

আমি বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম,

— না। আমার কোনো অভিযোগ নেই।

তিনি বললেন,

— তার মানে সুমি তার স্বামীর খেদমত যথাযথভাবেই করে। তাই তো?

— আমি বললাম, জি, হ্যাঁ।

তিনি বললেন,

— কিন্তু তোমার সারা গোষ্ঠীর খেদমত করতে গিয়ে কিছুটা ত্রুটি করে ফেলে, তাই তো?

কথাটা শুনে আমার বোনেরা খেক খেক করে উঠল। বাবা তাদের থামালেন।

আমি বললাম,

— জি, হ্যাঁ। আমার মা-বাবা, ভাই-বোন, বোনাই-বোনপো ইত্যাদি সকলের খেদমতে সে ত্রুটি করে।

শ্বশুর এবার ঠান্ডা গলায় বললেন,

— সুমির স্বামী তুমি একা, নাকি তোমার সাই গোষ্ঠীর সবাই তার স্বামী?

আমি খতমত খেয়ে বললাম,

— আজ্ঞে, স্বামী আমি একাই ছিলাম। কিন্তু বাড়ি আসার পর সেটা বেদখল হয়ে গেছে। এখন কে যে তার স্বামী আর কে যে কি তা আর বোঝা যায় না।

কথাটা শুনে আমাদের বাড়ির কাজের মেয়েটা হি হি করে হেসে উঠল। শ্বশুর বললেন,

— তা এখন এই বেদখল হওয়া জিনিস পুনর্দখল করার ইচ্ছা কি তোমার আছে?

আমি কিছু বললাম না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম। কথার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারিনি দেখে শ্বশুর বুঝিয়ে বললেন,

— এতগুলো স্বামীর হাত থেকে সুমিকে উদ্ধার করে তার একমাত্র স্বামী হিসেবে আলাদা ভাবে ঘর সংসার করার ইচ্ছা কি তোমার আছে?

আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না। কিন্তু আমি কি বলবো তা আমার স্ত্রী ভাল ভাবেই জানতো। সে চিৎকার করে বলল,

— বাবা, ও আর কি বলবে? ও একটা কাপুরুষ। স্বামী নামের কলঙ্ক। স্ত্রীর মান সম্মান নিয়ে চিন্তা করার কোন সময় নেই ওর।

শ্বশুর বললেন,

— তবে তো আর কোনো সমাধান দেখছি না। চলো মা, এমন স্বামীকে তালাক দিয়ে তুমি বাবার বাড়ি ফিরে চল।

কথাটা বলে তিনি সুমির হাত ধরে টানতে টানতে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেলেন। এই হলো বাবার সাথে আমার বউয়ের পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী। পালিয়ে গিয়ে সে যে বেঁচে গেছে তা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। তবে আমি পড়ে গেছি অথৈ সমুদ্রে। যে সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সংসার আলাদা করতে চাইনি তারাই এখন আমার মুখের উপরে কটু কথা বলছে।

রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে শুনি লোকেরা বলছে,

— এই লোকটার বউ পালিয়ে গেছে।

যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর! আমি নিশ্চিত, আপনি নিজেও মনে মনে আমার অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছেন। অথচ আপনার কারণেই আমার এই হাল হয়েছে।

ইমাম সাহেব মুখ কাচু মাচু করে বললেন,

— অকারণে বার বার আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন?

লোকটা এবার ধমক দিয়ে বলল,

— অকারণে নয়। যথাপোযুক্ত কারণেই আপনাকে দোষ দিচ্ছি।

ইমাম সাহেব বললেন

— তা কারণটা কি একবার জানতে পারি?

লোকটা বলল,

— সে কথাই তো শুরু করেছিলাম।

তারপর আবার আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। ইমাম সাহেব একটু অবাক হয়ে বললেন,

— শুরু করেছিলেন?

— হ্যাঁ। ঐ যে বলছিলাম না, কয়েক মাস আগে আপনার কাছে আমি আরেকবার এসেছিলাম।

ইমাম সাহেব আমতা আমতা করে বললেন,

— তা বলছিলেন বটে। কিন্তু তাতে আমার দোষটা কোথায়?

লোকটা ধমক দিয়ে বলল,

— সেখানেই তো যত দোষ। সেদিন আমি আপনাকে কত অনুরোধ করে বললাম, পিতা-মাতার সাথে আলাদা হয়ে সংসার করাটা বৈধ কিনা বলুন। সেদিন যদি আপনি বৈধ বলতেন তবে আমি আলাদা হয়ে যেতাম। আমার সংসারটা টিকে যেত। কিন্তু আপনি আমাকে বললেন, মরে গেলেও একাজ করা যাবে না। এখানেই শেষ নয়। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই জুমার খুতবায় শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্বশুর-শাশুড়ির গায়ে পানি ঢেলে দেওয়া, পায়ে তেল মাখিয়ে দেওয়া, গামছা নিয়ে দাড়িয়ে থাকা, পাখা হাতে বাতাস করা ইত্যাদি খেদমতের সিস্টেম তো আপনিই বাতলে দিয়েছেন। আর বাবা গিয়ে মাকে সেগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। তাতেই তো বেটার বউদের উপর দিনকে দিন চাপ বেড়ে গেছে। শুরু হয়েছে চরম জুলুম নির্যাতন। একটিবারের জন্যও সে জুলুম নির্যাতন সম্পর্কে আপনি কিছুই বলেননি। সেই জুলুমের ঠেলাই তো আমার বউটা পালিয়েছে। এসবের জন্য আপনিই দায়ী। এখন আমার সংসারটা ভাঙনের মুখে। এখন যদি আমার বউ আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয় তবে আপনাকে আমি মজা দেখিয়ে ছাড়ব।

ইমাম সাহেব এতক্ষণে নিজের অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন,

— কুরআন হাদীস যা বলে আমি তো সেটাই বলেছি। আপনি না হয় আর দশজন মৌলভীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

— দশ জনের কাছ থেকে আমি শুনবো না। শুনলে আপনার মুখ থেকেই শুনবো। হক কথা আপনার মুখ থেকেই আমি বের করে তাই ছাড়ব। সে উপায় আমার জানা আছে। শুধু ডিভোর্সটা হয়ে যাক। তখন আমি আপনাকে মজা দেখাবো।

গুন্ডা ছেলেটার মুখে বারবার মজা দেখানোর হুমকি শুনে ইমাম সাহেব পুরাই ঠান্ডা মেরে গেলেন। বাচ্চা ছেলের মত কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন,

— কেমন মজা দেখাবেন?

কথাটা শুনে এত রাগের মাঝেও হি হি করে হেসে উঠল লোকটি। তারপর বলল,

— অভিনয় তো আপনারা ভালই পারেন। টাকা তোলার সময় মানুষের কাছে ফকীর-মিসকিনের মত হাউ মাউ করা, মোনাজাতের সময় হু হু করে কেঁদে ওঠা, নামাজের মধ্যে কোকিলের মত করুণ স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা এসবই তো আপনাদের অভিনয়। আপনাকে আমি এবার অভিনয় করতেই বাধ্য করবো।

অভিনয় করার কথা শুনে হুজুর বেশ খুশি হলেন। ছোট থেকেই তার অভিনয় করার সখ। যখন মাদ্রাসায় পড়তেন মাঝে মাঝে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সিনেমা ঘরে যেতেন ছবি

দেখার জন্য। একবার কি একটা সিনেমা দেখে খুব মজা পেয়েছিলেন। নায়কের নাম ছিল বিটকেল। নায়িকার নাম কি ছিল মনে নেই। ইট-পাটকেল যাই হোক একটা হবে। সেই সিনেমাটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই তিনি মনে মনে ভীষণ মজা পেলেন। তিনি ভাবলেন, সেক্রেটারী সাহেবের ছেলে যে অভিনয়ের কথা বলছে তা এমনই মজাদার হবে। একারণেই হইত সে বারবার মজা দেখানোর হুমকি দিচ্ছে। তিনি বললেন,

— অভিনয়ের ব্যাপার হলে আমাকে বাধ্য করা লাগবে না। আমি নিজ থেকেই করবো।

ছেলেটা বলল,

— তবে তৈরি হয়ে থাকবেন।

তারপর সে চলে গেল। আর ইমাম সাহেব এ কটা দিন অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন। আর মনে মনে দোয়া করতে থাকলেন যেন লোকটার বউ তাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। যাতে তার অভিনয় করার সুযোগ হয়।

দুই.

জুময়ার দিন ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার সময় এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। তিনি আসলে দেখছেন, সেক্রেটারীর ছেলে স্বপন হাজির আছে কিনা। আজ তিনি একটু ভিন্ন ধরনের ওয়াজ করতে চান। সে ওয়াজকে তোয়াজ বলা হবে না কি কেওয়াজ বলা হবে সেটা তিনি জানেন না। কেবল এতটুকু জানেন যে তাতে তার স্বার্থ রয়েছে। তবে ওয়াজটা করতে হলে স্বপনের অনুপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। একারণেই তিনি এদিক সেদিক তাকিয়ে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। যখন মনে হলো স্বপন এখনও উপস্থিত হয় নি ফট করে মনের কথাটা বলে ফেললেন তিনি।

— যে সব স্বামীরা স্ত্রীদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না সে সব স্ত্রীদের উচিত স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়া।

এরকম আরও অনেক কথা বললেন তিনি। উদ্দেশ্য অভিনয়ের সুযোগটা পাকাপাকি করে নেওয়া। সুমিদের বাড়ি এই গ্রামে নয়। অতএব ইমাম সাহেবের কথা তারা শুনতে

পাবে না এটাই স্বাভাবিক। তবুও কথায় বলে, চেষ্টার মার নেই। তাই তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হঠাৎ স্বপনকে মসজিদে ঢুকতে দেখে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন।

— ভাই সব, হাদীসে পাকে এসেছে, যে মহিলা তার স্বামীকে ছেড়ে যায় তার উপর ফেরেস্তারা সারারাত অভিসম্পাত করেন। সবাই বলুন নাউযুবিল্লাহ।

উপস্থিত মুছল্লিরা একযোগে বলে উঠলো,

— নাউযুবিল্লাহ।

তাদের কেউই আগের ওয়াজের সাথে পরের ওয়াজের কোনো অমিল খুজে পেলো না।

এর কদিন পর ইমাম সাহেবের আশা পুরা হলো। সুমীর কাছ থেকে স্বপনের ডিভোর্স পেপার চলে এলো। পেপারটা হাতে পেয়ে স্বপন যে খুব বেশি দুঃখ পেলো তা নয়। আগে থেকেই সে জানতো এমন কিছু একটাই হবে। তাই দুঃখ পাওয়ার বদলে তার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে সে বলল,

— এবার শুরু হবে আসল খেলা।

রাতে খাওয়ার পর ইমাম সাহেব যথারীতি পান চিবাচ্ছেন এমন সময় ভূতের মত হঠাৎ করে সেখানে হাজির হলো স্বপন। ইমাম সাহেবের সামনে অসহায়ের মত কিছুক্ষণ বসে থাকলো। তার মুখের দিকে তাকিয়েই ইমাম সাহেব আসল ঘটনা বুঝতে পারেন। তার মুখটা হাস্যজ্জল হয়ে যায়। তার মনে হয় এতদিনে তার ইচ্ছা পুরা হয়েছে। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি বলেন,

— মিয়া সাহেবের খবর কি?

মুখে দুঃখী দুঃখী একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে স্বপন তার বাম পকেট থেকে কিছু কাগজ পত্র বের করে ইমাম সাহেবকে দেখিয়ে বলে,

— ডিভোর্স পেপার এসে গেছে।

কথা শুনে ইমাম সাহেব বেজায় খুশি হলেন। সহাস্যে বলে উঠলেন,

— তাহলে আমি অভিনয় করার সুযোগ পাচ্ছি। কি বলেন?

মুচকি হেসে স্বপন বলে,

— তা তো বটেই।

সেটা শুনে ইমাম সাহেবের হাস্যজ্জল মুখটা আরও বেশি উজ্জল হয়ে যায়। মুখের হাসি হাসি ভাবটা ধরে রেখেই তিনি বলেন,

— আচ্ছা মিয়া সাহেব, ছবির নামটা কি?

প্রশ্ন শুনে স্বপন একটু অবাক হয়ে বলল,

— ছবি মানে! কোন ছবি?

ইমাম সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন,

— মানে যে ছবিতে আমি অভিনয় করবো সেই ছবিটার নাম কি?

এতক্ষণে স্বপন সব ঘটনা বুঝতে পারে। স্বপন সে দিন যে অভিনয়ের কথা বলেছে এই বেটা সেটাকে চিত্র জগতের অভিনয় মনে করেছে। আর তাই এ ব্যাপারে এতবেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। একটু ভেবে সে বলল,

— ছবির নাম বউ শাশুড়ির লড়াই।

নামটা শুনে ইমাম সাহেবের ভীষণ হাসি পেলো। কিন্তু তিনি হাসলেন না। যে ছবিতে তিনি নিজেই অভিনয় করবেন তার নাম শুনে হাসা ঠিক না। একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ থেকে তার মনে খোঁচা দিচ্ছে। লজ্জার খাতিরে তিনি প্রশ্নটাকে দাবিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আর পারলেন না। লাজুক মুখে বললেন,

— আচ্ছা মিয়া সাহেব, ছবিতে আমার ভূমিকা কি হবে? নায়ক?

লোকটার স্বপ্ন বিলাস দেখে ভীষণ অবাক হয় স্বপন। মুচকি হেসে বলে,

— না না। নায়ক নয়। তবে নায়কের কাছাকাছি।

কথা শুনে ইমাম সাহেব মোটেও নাখোশ হলেন না। সিনেমাতে একটা রিকশা চালক হতে পারলেও তিনি খুশি। আর নায়কের কাছাকাছি একটা ভূমিকা পাওয়া তো বিরাট ব্যাপার। তবে ভূমিকাটা ঠিক কি সেটা জানার জন্য তার মনটা আকু পাকু করতে থাকে। বিষয়টা নিয়ে আবারও প্রশ্ন করলে স্বপন হেয়ালী করে বলে,

— আপনাকে যে চরিত্র দেওয়া হবে তাতে একটা সমস্যা আছে।

সমস্যার কথা শুনে ইমাম সাহেবের বুকটা ধক করে ওঠে। তবে কি তার অভিনয় করা হবে না। মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলে বলেন,

— কি সমস্যা?

স্বপন বলে,

— সমস্যা এমন কিছু না। অভিনয় করতে হলে আপনাকে দাড়ি-গোঁফ কাটতে হবে।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেব হেসে ফেললেন। গোঁফ-দাড়ি কি আর হাত না হাতের আঙ্গুল যে তা কেটে ফেলতে সমস্যা হবে। দাড়ি তো তার আগেও ছিলো না, পরে রেখেছেন। হাফেজ হওয়ার পরও বেশ কিছু দিন তার দাড়ি ছিলো না। সমাজের লোক বলতো,

— হাফেজ মানুষের মুখে দাড়ি নেই। ছি!

লোকের মুখে এরকম এক ছি, হাজার ছি শুনেও তিনি তখন দাড়ি রাখেন নি। তবে রমজান মাসে কোথাও তারাবী পড়ানোর দায়িত্ব পেলে তিনি কয়েকদিন দাড়ি সেভ করতেন না। শেষে যখন স্থায়ী ভাবে ইমামতী পেয়ে গেলেন তখন আর দাড়ি না রেখে কোনো উপায় ছিলো না। দাড়ি তাই তার নিকট আবশ্যিক কোনো বিষয় নয়। চাকরীর প্রয়োজনে রেখেছেন। যদি অন্য চাকরি পেয়ে যান তবে কাটতেও কোনো অসুবিধা নেই। বিষয়টা চিত্র জগতের নায়িকাদের পরচুলা পরার মতো। যখন কম বয়সী আর সুন্দরী সাজতে হয় তখন তারা কালো চুল পরে। আর যখন অভিনয়ের প্রয়োজনে বুড়ি সাজতে হয় তখন পরে সাদা চুল। এসব কোনো সমস্যা নয়। বিষয়টা স্বপনকে বুঝিয়ে দিতেই সে বলে উঠে,

— তবে তো কোনো সমস্যাই নেই।

সমস্যা নেই শুনে ইমাম সাহেবের দেলটা আবারও শিতল হয়ে যায়। অভিনয়টা তাহলে তার মিস হচ্ছে না। তবে একটা বিষয়ে তার মনে খটকা লাগে। অভিনয় করতে হলে দাড়ি কাটতে হয় বিষয়টা তিনি জানেন। কিন্তু গোঁফ কাটতে হবে কেনো সেটা বুঝতে পারেনা। অনেক নায়কেরই তো গোঁফ থাকে। তিনি ভাবেন, হয়তো তাকে কম বয়সী যুবকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। সে যাই হোক, তার নিকট এসব কোনো সমস্যা

নয়। নবীর সুন্নাত দাড়িই যখন কাটতে পারবেন তখন গোঁফ কাটা আর এমন কি ব্যাপার। বিনিতভাবে তিনি বলেন,

— নায়কের কাছাকাছি সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো, আমার ভূমিকাটা কি?

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে স্বপন বলে,

— আপনি হলেন, ঐ ছবির নায়িকা।

ইমাম সাহেবের মাথায় যেনো বাজ পড়লো। ঠোট বাকা করে বললেন,

— নায়িকা!

স্বপন খুব স্বাভাবিক ভাবে বলল,

— হু

ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— কিন্তু আমি তো পুরুষ মানুষ।

স্বপন তাকে আশ্বস্ত করে বলে,

— পুরুষ মানুষ কি মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করে না? যাত্রাপালা দেখেননি কখনও?

ইমাম সাহেব সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়েন। তিনি যাত্রাপালা দেখেছেন। তার বাবার শখ ছিলো, ছেলে মাদারাসায় পড়বে, বড় আলেম হবে, দ্বীনের জন্য কাজ করবে। তার প্রথম ইচ্ছাটা পুরা হয়েছে। তার ছেলে সারাটা জীবন মাদ্রাসাতেই পড়েছে। হেফজী পড়ার পর মাওলানার ক্লাসেও পড়েছে কিছুদিন। মুফতিও হয়তো হতো কিন্তু সময় পায় নি। চারিদিক থেকে মিলাদ আর খতমের দাওয়াত আসতে লাগলো। সেসব সামলাতে গিয়ে পড়াশুনাটা চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয় নি। যায় হোক, মাদ্রাসাতে এতদূর পড়াশুনা করেও তিনি কিন্তু সত্যিকার আলেম হতে পারেননি। তাকওয়াবান লোকও ছিলেন না কখনও। সময় সুযোগ পেলেই সিনেমা যেমন দেখেছেন যাত্রাপালাও উপভোগ করেছেন সমান ভাবে। তাই তিনি জানেন, পুরুষ লোক অনেক সময় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে। অনেকে এত সুন্দর অভিনয় করে যে, না বললে বোঝায় যায় না সে

আসলে পুরুষ। ইমাম সাহেব মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেন,

— আমি এমন অভিনয় করবো যে, সারা বিশ্বের লোক একনামে আমাকে চিনে ফেলবে। বলবে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নায়িকা হাফেজ মাওলানা আকবার আলী।

কথাটা বলার পরই তার মনে হলো, কোথাও যেনো কি একটা সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তা করে তিনি বুঝতে পারেন অন্য কিছু নয় তার নাম আর পদবীর সাথে নায়িকা শব্দটা মিল খাচ্ছে না। আসলে এ নামটা তিনি ভেবে রেখেছিলেন বক্তা হওয়ার জন্য। কিন্তু সেটা তার কপালে লেখা ছিলো না। তার কণ্ঠস্বর একেবারে মহিলাদের মত চিকন। মঞ্চে উঠে বক্তব্য দিলেই মানুষ হাসাহাসি করে। দূর থেকে লোকেরা মনে করে মহিলা হুজুর ওয়াজ করছে। যে কোনো এলাকায় একবার ওয়াজ করার পর আর দাওয়াত আসে না। অনেক সময় তো এমন হয়েছে যে, ওয়াজ করার পর কমিটির লোকেরা টাকায় দিতে চায় না। শেষে অবশ্য তিনি একটা ফন্দি করেছিলেন। আজগুবি একটা গল্প বানিয়েছিলেন। দেশময় রটিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আসলে মহিলা ছিলেন। মহান রবের অশেষ কৃপায় তিনি মহিলা থেকে পুরুষ হয়ে গেছেন। কণ্ঠের সাথে সাথে তার শরীরটাও ছিলো বেশ নরম আর তুলতুলে। আজগুবি গল্পটা মানুষ তাই সহজেই বিশ্বাস করেছিলো। যাদের অন্তরে একটু সন্দেহ হতো তারা এসে শরীরের বিভিন্ন অংশ টিপে টিপে দেখতো। এর পর আর কেউই গল্পটার সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করতো না। এভাবে তার ওয়াজের বাজার বেশ রমরমা হয়ে উঠলো। নানা জায়গায় দাওয়াত পড়তো আর অনেক টাকা ইনকাম হতো। তখন সবাই তাকে বলতো, আন্মাজান হুজুর। তবে এমন সার্কাস আর কদিন চলে। তাছাড়া মাঝে মাঝে কিছু অবিশ্বাসী লোক খুব জ্বালাতন করতো। নানা রকম প্রশ্ন করতো। আর অকারণে শরীরের এখানে সেখানে টেপাটিপি করতো। কেউ কেউ বলতো,

— আপনি আবার মেয়ে হয়ে গেলে আমি আপনাকে বিয়ে করবো।

এতকিছুর পরও তিনি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে শেষে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার ফলে ব্যবসাটা বন্ধ করতেই হলো। একদিন তার কাছে একটা চিঠি আসলো। তাতে লেখা ছিলো,

— ধর্মের নামে ফাজলামী বন্ধ করুন। তা না হলে এক গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে

দেব।

এর পর কি আর ব্যবসা করা যায়। কথায় বলে, মান গেলে মান পাৰি, জান গেলে জান পাৰি না। তাই তিনি ঐ ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন বেকার অবস্থায় জমানো টাকা পয়সা গুলো ভাঙ্গিয়ে খেলেন। পরে বাধ্য হয়ে এই এলাকার মসজিদে ইমামতির চাকরি নিয়ে কোন রকমে দিনপাত করছেন। এখন যদি তিনি চিত্রজগতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েই যান তবে মাঠ কাপিয়ে দেবেন। সারা দেশের লোক তাকে এক নামে চিনবে। নামটা কি হবে সেটা তিনি পরে ঠিক করে নেবেন। স্বপনকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, এমনকি নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতেও তিনি রাজি আছেন। কথাটা শুনে স্বপন খুশি হয়ে বলল,

— বেশ ভালো। তবে অভিনয়টা কিন্তু চিত্র জগতে নয়।

কথাটা শুনে এবার কেবল বাজ নয় পুরা আকাশটাই যেনো ইমাম সাহেবের মাথায় ভেঙে পড়ল। নিরাশ গলায় তিনি বললেন,

— তবে কি যাত্রাপালায়?

স্বপন হালকাভাবে মাথা নাড়লো।

— উহু, ওসব কিছু নয়।

ইমাম সাহেব ভীষন বিরক্ত হয়ে বললেন,

— তবে কি?

স্বপন বলল,

— আপনাকে অভিনয় করতে হবে বাস্তব জীবনে।

ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— বাস্তব জীবনে আবার অভিনয়! এর মানে কি?

স্বপন এবার বিষয়টা বুঝিয়ে বলল,

— আমার বউ আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে। এখন আপনি আমার বউ সেজে

আমাদের বাড়ি যাবেন। কদিন থাকবেন। বুঝবেন বেটার বউ হওয়ার কি জালা। এই সামান্য কাজ।

কথা শুনে ইমাম সাহেব ভীষণ রেগে গেলেন।

— আপনার বাড়ি গিয়ে আপনার বউ হয়ে আমি অভিনয় করবো? আপনি কি পাগল হয়েছেন?

ইমাম সাহেবকে কড়া গলায় কথা বলতে দেখে স্বপন বুঝতে পারলো, একটু ওষুধ দিতে হবে। পকেট থেকে সেদিনের সেই দড়িটা বের করে ইমাম সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বলল,

— পাগল এখনও হয়নি। তবে যে কোনো মুহূর্তে হয়ে যেতেও পারি।

দড়িটির দিকে এক পলক তাকাতেই ইমাম সাহেবের গত দিনের সব ঘটনা মনে পড়ে গেলো। আতঙ্কে তিনি শিউরে উঠলেন। সেই প্রবাদ টি মনে পড়ে গেলো, মান গেলে মান পাবি, জান গেলে জান পাবি না। পুরুষ মানুষ হয়ে কারও বউ সেজে অভিনয় করা নিঃসন্দেহে অপমানজনক। তবে জান যাওয়াটা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। ইমাম সাহেব তাই মেজাজ ঠাণ্ডা করে বললেন,

— আহা রেগে যাচ্ছেন কেনো মিয়া সাহেব? আপনি বললে আমি গরু ছাগলের ভূমিকায়ও অভিনয় করতে রাজি আছি। কিন্তু অকারণে এসব করার কি দরকার বলুন?

ইমাম সাহেবকে আত্মসমর্পণ করতে দেখে কিছুটা শান্ত হয়ে স্বপন বলে,

— দরকার তো অবশ্যই আছে। খুব জরুরী দরকার।

ইমাম সাহেব অনুন্নয় করে বললেন,

— তবে সেটা কি আমাকে বলুন। আমি সানন্দে আপনার বউ সেজে অভিনয় করবো।

স্বপন বলল,

— এই যে আমার বউ বাবার হাত ধরে স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছে। বেশ কিছুদিন বাবার বাড়িতে ছিল। আমি বললেও আসেনি। আমার আদেশ অমান্য করেছে। শেষে এমনকি ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে। আমি জানতে চাই তার জন্য এসব কাজ করা বৈধ হয়েছে

কিনা? এসব ঘটনায় আমি দোষী নাকি আমার বউ দোষী?

ইমাম সাহেব কাল বিলম্ব না করে বললেন,

— অবশ্যই আপনার বউ দোষী। আপনি হলেন গিয়ে স্বামী। আর সে হলো বউ। আপনাকে ছেড়ে যাওয়া বা আপনার অবাধ্য হওয়া তার জন্য কখনও বৈধ নয়। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে, যে বউ তার স্বামীকে ছেড়ে যায় বা স্বামীর অবাধ্য হয় তার উপর ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়। আর এই যে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়া এটা তো মারাত্মক অন্যায়। হাদীসে বলা হয়েছে, স্বামীর কাছে তলাক চাওয়া হারাম। তাহলে নিজেই তলাক দিয়ে দেওয়া কত বড় অন্যায় ভেবে দেখুন!

স্বপন বলে,

— শ্বশুর-শাশুড়ি বা দেবর-ননদ যদি অত্যাচার করে আর স্বামী তার কোন প্রতিকার না করে তবুও কি একতরফা ভাবে বউ দোষী হবে? এ বিষয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন না তো?

ইমাম সাহেব স্বপনের মনের অবস্থা বুঝতে পারেন। অভয় দিয়ে বলেন,

— কোন চিন্তা করবেন না মিয়া সাহেব। এখানে জুলুম তো আর আপনি করেননি। করেছে আপনার বাবা-মা। তাদের উপর তো আপনার কিছুই করার বা বলার ক্ষমতা নেই। আর কুরআনে পাকে বলা হয়েছে, কাউকে তার সাথের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

স্বপন লক্ষ্য করল, ইমাম সাহেব আরও একটা দলিল দিলেন। তার নিকট মনে হচ্ছে এই দলিলটির মধ্যেও কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু সেটা যে কি তা সে ধরতে পারে না। মনে মনে হেসে ওঠে সে। খুব শিঘ্রই আসল খবর জানা যাবে। কোন দলিল যে কোন দিকে গড়াবে সেটা তখন টের পাওয়া যাবে। ইমাম সাহেব হাবি-জাবি কথা বলে যাচ্ছেন। তার কথার মধ্যে তোয়াজ ও কেওয়াজ উভয়ই রয়েছে। তিনি যা বলছেন মিয়া সাহেবের ছেলেটাকে তোয়াজ করেই বলছেন। আবার দলিল প্রমাণ ছাড়াও অনেক কথা বলছেন। স্বপন হাত তুলে তাকে থামিয়ে ধমক দিয়ে বলে,

— দেখুন, শাশুড়ি পক্ষের ওয়াজ অনেক শুনেছি। এবার একটু বেটার বউ পক্ষের ওয়াজ

শুনতে চাই।

ইমাম সাহেব এতক্ষণে স্বপনের মানসিকতা অনুধাবন করতে পারে। আড় চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে বলেন,

— ও এই ব্যাপার! এতো খুব সহজ কথা। ও ওয়াজও আমার জানা আছে। বলবো?

স্বপন আগ্রহী হয়ে বলে,

— বলুন তো একটু শুনি!

ইমাম সাহেব শুরু করলেন,

— দেখুন নারী-পুরুষ সমান অধিকার। স্বামী বলে যে আমি লাট হয়ে গেছি এমন মনে করা অনুচিত। কোন এক কবি বলেছেন,

স্বামী যদি রাজা হয় বউ হলো তার রানী

স্বামী যদি মাছ হয় বউ হলো তার পানি।

কি সুন্দর কবিতা! তাই না?

বলে ইমাম সাহেব আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু স্বপন তাকে থামিয়ে ধমক দিয়ে বলল,

— এসব আমি শুনতে চাচ্ছি না। আমি শুনতে চাচ্ছি কুরআন হাদীসের দলিল-প্রমাণ। স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে কি বলা হয়েছে সেটা বলুন।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেবের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও এব্যাপারে তিনি কোন হাদীস মনে করতে পারলেন না। কিছু কিছু হাদীস আবছা ভাবে মনের পর্দায় ভেসে উঠছে কিন্তু পুরাপুরি মনে পড়ছে না। শ্বশুর-শাশুড়ির ওয়াজ করতে করতে বেটার বউদের হাদীস সব ভুলে বসে আছেন। অনেক চেষ্টা করে একটা বিষয় কেবল মনে করতে পারলেন। আর তখনই মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন,

— দেখুন পবিত্র কুরআনে মেয়েদের নামে একটা সূরা নাযিল করা হয়েছে। তার নার সূরা নিসা। নিসা মানে মেয়ে বা মহিলা। বুঝে দেখুন, মেয়েদের কত মর্যাদা! আস্ত একটা সূরাই তাদের নামে।

বলে হি হি করে হাসতে থাকেন তিনি। স্বপন কিন্তু একটুও হাসলো না। উল্টো ধমক দিয়ে বলল,

— কেবল সূরার নাম বললে হবে? তার ভিতরে কি আছে তা বলুন।

ইমাম সাহেব এবার মহা ফাপড়ে পড়ে গেলেন। কেবল সূরা নিসা নয় এক সময় পুরা কুরআনই তার মুখস্থ ছিল। কিন্তু চর্চার অভাবে সবই ভুলে বসে আছেন। তাছাড়া মনে থাকলেও কোন লাভ হতো না। তিনি অর্থ বুঝতেন না। এমনিতে হাফেজরা কেবল কুরআন মুখস্থ রাখে, অর্থ বলতে পারে না। ইমাম সাহেব অবশ্য কেবল হাফেজ নন মাওলানাও পড়েছেন। তবে তা নামকেওয়াস্তে। লেখাপড়াতে এখন যে ফাকিজুকি তাতে মাওলানা পড়লেও সবাই মাওলানা হতে পারে না। অতএব, সূরা নিসায় মেয়েদের নিয়ে আদৌও কিছু বলা হয়েছে কিনা বা বলা হয়ে থাকলে সেটা কি সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। বিনিতভাবে বললেন,

— সেসব আমার স্মরণ নেয়।

ইমাম সাহেব ভেবেছিলেন, কথাটা শুনে মিয়া সাহেবের ছেলে রেগে যাবেন। সত্যি বলতে ধমক খাওয়ার একটা পূর্ব প্রস্তুতিও তিনি নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ব্যাপার ঘটল তার উল্টো। কথা শুনে স্বপন এমন ভাব করলো যেন মনে হলো এমনই কিছু একটা আশা করেছিল। অনেকটা ঠান্ডা মেজাজে সে বলল,

— ভুলে যে গেছেন সেটা আমি আগে থেকেই জানতাম। তাই কিভাবে স্মরণ করানো যায় সে পন্থাও আগে থেকেই ভেবে রেখেছি।

কথাটা শুনে ইমাম সাহেব বেজায় খুশি হয়ে বললেন,

— তাই নাকি? তা পন্থাটা কি?

স্বপন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলল,

— আমার বউ হয়ে আপনাকে কটা দিন অভিনয় করলেই সব হারানো বিদ্যা আপনি ফেরত পাবেন।

কথাটা শুনে এবার আর ইমাম সাহেব আকাশ থেকে পড়লেন না। যেহেতু কথাটা তিনি আগেও একবার শুনেছেন। তবে তিনি মনে মনে ভীষন অবাক হলেন। কারও বউ হয়ে

কদিন কাটালে হারানো বিদ্যা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। পীরের মুরিদ হলে অনেক ফায়েয-বরকত হয় সেটা তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদের মুখে শুনেছেন। কিন্তু মিয়া সাহেবের ছেলের বউ হয়ে থাকলে কি ধরনের ফায়েজ-বরকত হতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না। এ ব্যাপারে তাই তিনি এক প্রকার আগ্রহই বোধ করতে লাগলেন। কয়েকদিন কারও বউ সেজে অভিনয় করলে যদি হারানো বিদ্যা ফিরে আসে তবে মন্দ কি। বিদ্যা তো খুব ভালো জিনিস। মাদ্রাসায় গিয়ে যা দুকলম বিদ্যা শিখেছেন তাই দিয়েই তো এখন করে কর্মে খাচ্ছেন। তিনি তাই বেশ আগ্রহ নিয়ে বললেন,

— ব্যাপার যদি এই হয় তাহলে আমি আপনার প্রস্তাবে সানন্দে রাজি।

কথাটা শুনে সামনে রাখা দড়িটি তুলে নিতে নিতে স্বপন বলল,

— সানন্দে রাজি হওয়াটাই ভালো। আমি আবার কাউকে বাধ্য করা একেবারেই পছন্দ করিনা। কাউকে কোনো কাজে বাধ্য করতে হলে তার উপর আমার ভীষন রাগ হয়। তখন আমি কি করতে গিয়ে যে কি করে ফেলি তা ঠিক থাকে না।

দড়িটির দিকে তাকাতে তাকাতে ইমাম সাহেব বললেন,

— ঠিকই তো, ঠিকই তো। বিয়ে হলো শুভ কাজ যাকে বলে শুভ বিবাহ। শুভ কাজে আবার কাউকে বাধ্য করতে হয় নাকি? যে কোনো সময় আপনার বউ সাজতে আমি রাজি।

স্বপন ঞ্চ কুচকে বলল,

— যেকোনো সময়?

ইমাম সাহেব তড়িঘড়ি করে বললেন,

— হ্যা হ্যা যেকোনো সময়। আপনি কাজী ডাকলেই আমি সেখানে হাজির হয়ে যাব।

কথা শুনে স্বপন হো হো করে হেসে বলল,

— যখন তখন হাজির হলেই হবে? আপনার দাড়ি গোঁফ বেশ ভুষা এগুলো পাল্টাতে হবে না? তাছাড়া আপনার বিবিটাকে বাপের বাড়ি পাঠাতে হবে। ইমামতির চাকরি

থেকে ছুটি নিতে হবে।

ইমাম সাহেব বোকার মত বললেন,

— তাই তো। এসব নিয়ে তো ভাবিনি।

স্বপন চিন্তিত হয়ে বলল,

— তাহলে এসব কিভাবে সামলাবেন?

ইমাম সাহেব কিছু বলতে পারলেন না। কেবলই মুখ বুজে বসে থাকলেন। স্বপন ধমক দিয়ে বলল,

— বলুন কিভাবে সামলাবেন?

ধমক শুনে ভয় পেয়ে ইমাম সাহেব বললেন,

— আপনি পুরুষ মানুষ। দেখে শুনে একটা উপায় বের করে দিন।

কথা শুনে স্বপন হি হি করে হেসে উঠে বলল,

— আমিও পুরুষ মানুষ নয়। পুরুষ মানুষ হলে আমার বউ পালাতো না। তবে চিন্তা করবেন না। উপায় আমার আগে থেকেই ভাবা আছে।

কথা শুনে ইমাম সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাহলে তাকে আর ধমক শুনতে হবে না। স্বপন তখন তাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিল।

— শুনুন, এক টিলে দুই পাখি মারতে হবে। এক হলো আপনার চাকরী। আর এক হলো আপনার স্ত্রী।

ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— স্ত্রীকে টিল মেরে মেরে ফেলব?

স্বপন ধমক দিয়ে বলল,

— আপনি দেখি একটা আস্ত গাধা। মেরে ফেলবেন কেনো?

— তাহলে কি করব?

— আগে চুপ করে শুনুন। আপনার স্ত্রীকে বলবেন, স্বপ্নে দেখলাম, তোমার পেটে বাচ্চা।
তাই তোমাকে কদিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছি। আর আমার বাবার
কাছে গিয়ে বলবেন, আপনার স্ত্রীর পেটে টিউমার। চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে
আপনাকে বিদেশে যেতে হবে। তাই আপনার কদিনের ছুটির প্রয়োজন।

কথা শুনে ইমাম সাহেব খুব খুশি হয়ে বললেন,

— আপনার মাথায় অনেক বুদ্ধি তো।

স্বপন বলল,

— বুদ্ধির আর দেখেছেন কি। সবে তো শুরু। যাই হোক বাবার কাছে যাওয়ার সময়
আমাকে সাথে নেবেন। তাহলে ছুটি পেতে সমস্যা হবে না। আর আপনার বউকে আপনি
নিজেই সামলাবেন।

ইমাম সাহেব অভিমান করে বললেন,

— সহজ ব্যাপারটা আপনি নিলেন আর কঠিনটা চাপিয়ে দিলেন আমার উপর।

স্বপন অবাক হয়ে বলল,

— মানে?

ইমাম সাহেব স্বাভাবিক ভাবে বললেন,

— আপনার বাবাকে ওয়াজ করে না হলেও তোয়াজ করে সামলানো যায়। কিন্তু বউয়ের
কাছে ওয়াজ-তোয়াজ কিছুই কাজ করে না। সে কেবলই কেওয়াজ করে।

স্বপন বলল,

— একদিকে নিজের বউটা তোয়াজ করে সামলাচ্ছেন। অন্য দিকে শ্বশুর-শাশুড়ির পক্ষে
ওয়াজ করে পরের বউ ভাগিয়ে দিচ্ছেন। ব্যাপারটা কি?

তারপর ধমক দিয়ে বলল,

— আপনার বউ আপনিই সামলাবেন। আমি নিজের বউই সামলাতে পারিনি। তাই এ
দায়িত্ব আমার নেওয়া ঠিক হবে না।

ধমক খেয়ে ইমাম সাহেব দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন।

তিন.

বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই ইমাম সাহেবের স্ত্রী তার চিরাচরিত কেওয়াজ শুরু করলেন। বাড়িতে তেল-লবণের ঘাটতি, চালের কমতি, আর অভাব অনটনে অবস্থার যে অবনতি ঘটেছে ঝগড়ার ভাষায় তিনি স্বামীর নিকট তা তুলে ধরেন। এ সময়টুকু ইমাম সাহেব দাড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। এর পর যখন তার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলে,

— কলা গাছের মত হা করে দাড়িয়ে আছো কেনো? বসো।

ইমাম সাহেব তখন বসতে বসতে স্ত্রীর ভুল শুধরে দেন।

— কলাগাছ দাড়িয়ে থাকে। তবে হা করে থাকে না।

তার কথা শুনে তার স্ত্রী কখনও হেসে ওঠেন আবার কখনও নতুন করে কেওয়াজ শুরু করেন। এর কোনোটি ইমাম সাহেবের অপছন্দ নয়। প্রতিদিন শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে। আজ কিন্তু কেওয়াজ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কেওয়াজের শুরুতেই ইমাম সাহেব বললেন,

— সুখবর শুনেছো?

সুখবরের কথা শুনেই ইমাম সাহেবের স্ত্রী মুখ বন্ধ করে কান খাড়া করে ফেললেন। সেই ফাঁকে ইমাম সাহেব চৌকিতে বসতে বসতে বললেন,

— শুনলাম তোমার নাকি পেটে বাচ্চা।

কথাটা শুনেই তার স্ত্রী খুশিতে ডগমগ হয়ে গেলো। আনন্দে তার মনটা নেচে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ তার মনে কি একটা খটকা লাগলো। কৌতুহলী হয়ে বললেন,

— তুমি কিভাবে জানলে?

ইমাম সাহেব খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন,

— স্বপন বলল।

তার স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন,

— স্বপন কে?

— সেক্রেটারি সাহেবের ছেলে।

ইমাম সাহেবের স্ত্রী এবার ভীষন রেগে গিয়ে বললেন,

— সেক্রেটারি সাহেবের ছেলে তোমাকে বলেছে আমার পেটে বাচ্চা?

ইমাম সাহেব এবার নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তড়িঘড়ি করে বলেন,

— না না। স্বপন নয়, স্বপ্ন। আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমার পেটে একটা সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা।

স্বপ্নের কথা শুনে ইমাম সাহেবের স্ত্রী খুব খুশি হলেন। তিনি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন। আর পাঁচটা মেয়ের মতই সন্তান হওয়ার সুখবর শুনে তিনি তাই আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। খুব টেনে বললেন,

— সত্যি! তা কি হবে, ছেলে না মেয়ে?

ইমাম সাহেব এবার মহা ফাপড়ে পড়ে গেছেন। তড়িঘড়ি করে বলে ফেললেন,

— সেটা তো স্বপন ভাই বলে দেননি।

তার স্ত্রী চোখ রাঙা করে তাকিয়ে বললেন,

— আবারও স্বপন।

সাথে সাথে তিনি সংশোধন করে নিয়ে বললেন,

— না না। স্বপন নয়, স্বপ্ন। ছেলে কি মেয়ে স্বপ্নে তো আমি তা দেখিনি। কেবল দেখলাম পেটে বাচ্চা।

ব্যস, এতটুকুই যথেষ্ট হলো। তার স্ত্রী সাথে সাথে বেডিং পত্র গুছাতে লাগলো। ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— আরে আরে করছ কি?

তার স্ত্রী খুব আদুরে কণ্ঠে বলল,

— আমার সন্তান হচ্ছে খবরটা বাবা-মাকে দিতে হবেনা? তাই আমি আজই বাবার বাড়ি যাব।

ইমাম সাহেব মুখ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ বের করে বললেন,

— আহা ভুলেই গিয়েছিলাম।

তার স্ত্রী চোখ নাচিয়ে বললেন,

— কি ভুলে গিয়েছিলে?

ইমাম সাহেব আবারো মুখ ফসকে বলে ফেললেন,

— স্বপ্ন তোমাকে বাপের বাড়ি যেতে বলেছিলো।

এবার তার স্ত্রী আর ধমক না দিয়ে নিজেই ভুল শুধরে দিয়ে বললেন,

— তোমার স্বপ্নে আমার বাবার বাড়ি যাওয়ার কথাও বলে দিয়েছিলো। বাহ খুব সুইট স্বপ্ন তো।

এভাবে কঠিন দায়িত্বটি ইমাম সাহেব খুব সহজেই আদায় করে ফেললেন। ঠিক হলো আগামীকাল সকালেই তার স্ত্রীকে তিনি বাবার বাড়ি পৌঁছে দেবেন। এখন বাকি থাকলো কেবল ছুটি নেওয়ার বিষয়টি।

ফজরের নামাযের সময় সেক্রেটারি সাহেবকে মসজিদেই পাওয়া গেলো। তিনি আর দশটি মসজিদের সেক্রেটারির মত নন। তারা বছরে একবারও মসজিদে হাজিরা দেয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে এসে আদায় করেন। মসজিদে আসতে তার খুব ভালো লাগে। প্রতিদিন মসজিদে এসে তিনি নানা রকম খবরদারী করেন। কোথায় কোন ফ্যানটা অন করতে হবে, কোনটা অফ করতে হবে তা তিনিই বাতলে দেন। এ ব্যাপারে কোনো রকম ভুলভ্রান্তি হলে মুয়াজ্জিনকে বকাবকা করেন। একদিন ইমাম সাহেবকে ডেকে বললেন,

— বাবা শোনো, মসজিদে কখনও দেরি করে আসবে না। ঠিক সময় মতো আসবে।

ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— আমি তো কখনও দেরি করে আসি না মিয়া সাহেব। অকারণে আমাকে এ কথা কেনো বলছেন?

কথা শুনে সেক্রেটারি সাহেব রেগে গেলেন। বললেন,

— কখনও দেরি করে আসনি বলে গুরুজনেরা তোমাকে একটা উপদেশ দিতে পারবে না? এ কেমন কথা।

ইমাম সাহেব মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন,

— তা তো বটেই। আপনি আমার বাপের মতো। চাইলে জুতা খুলে মেরেও দিতে পারেন। তাতেও আমি কিছু মনে করবো না।

এহেনো তোয়াজ শুনে সেক্রেটারি সাহেব একেবারে গলে গেলেন। নরম স্বরে বললেন,

— তুমি কখন মসজিদে হাজির হও?

ইমাম সাহেব একান্ত বিনিতভাবে বললেন,

— আজ্ঞে সময় মতই হাজির হই।

সেক্রেটারি সাহেব ধমক দিয়ে বললেন,

— সময় মত হাজির হলেই হবে?

কথা শুনে ইমাম সাহেব থতমত খেয়ে বললেন,

— তবে কি লেট করে আসবো?

সেক্রেটারি সাহেব এবার আরও বড় ওজনের একটা ধমক দিয়ে বললেন,

— তুমি তো দেখি আস্ত গাধা। লেট করে আসবে কেন? দুপাঁচ মিনিট আগে আসবে। অন্য লোক তোমার দেখে শিখবে।

ইমাম সাহেব এবার বিষয়টা বুঝতে পারেন। জোরে জোরে মাথা ঝাকিয়ে বলেন,

— জি আচ্ছা, জি আচ্ছা।

পরের দিন ইমাম সাহেব দু পাঁচ মিনিটের বদলে দশ পনেরো মিনিট আগে চলে

আসলেন। এসে দেখেন মসজিদের কোথাও কেউ নেই। কেবল মুয়াজ্জিন সাহেব সবে মাত্র আজান দিয়ে মসজিদের এক কোণে বসে আছেন। ইমাম সাহেব নিজেও মসজিদের ভিতরে গিয়ে বসলেন। বেশ খানিকক্ষন পর তিনি দেখলেন, সেক্রেটারি সাহেব আসছেন। মনে মনে তিনি আশা করেন সেক্রেটারি সাহেব আজ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। তাই তাকে দেখেই তিনি উচু স্বরে সালাম দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সালাম শুনে সেক্রেটারি সাহেব যেনো চমকে উঠলেন। ধমক দিয়ে বললেন,

— তুমি এত সকালে মসজিদে এসে বসে আছ কেন?

ইমাম সাহেব কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। আমতা আমতা করে বললেন,

— আপনিই তো কাল আমাকে দু পাঁচ মিনিট আগে আসতে বলেছিলেন।

সেক্রেটারি সাহেব আবারও ধমক দিয়ে বললেন,

— তুমি দেখি একটা গাড়ল। তোমাকে আসতে বলেছি দু পাঁচ মিনিট আগে আর তুমি চলে এসেছো পনেরো মিনিট আগে। এভাবে কথার আগে আগে চললে হবে? শোনো, আমার বাবা আমাকে বলেছেন, সব সময় সবার আগে মসজিদে আসার জন্য। আমি সেই থেকে মসজিদে আগে আসার চেষ্টা করি। মুয়াজ্জিনের সাথে তো আর পারি না। তবে অন্য কেউ আমাকে পিছনে ফেলতে পারে না। কিন্তু আজ তুমি আমাকে পিছনে ফেলে দিয়েছো। চরম অন্যায় করেছে।

ইমাম সাহেব খতমত খেয়ে বললেন,

— সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে। এই কান ধরছি। আর কখনও এমন ভুল হবে না।

কথা শুনে সেক্রেটারি সাহেব খুশি হয়ে বললেন,

— মনে রাখবে গুরুজনের কথা সব সময় অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। একটুও আগ পেছ করবে না।

ইমাম সাহেব বিনীত ভাবে বললেন,

— ঠিক আছে করব না।

এর পর থেকে ইমাম সাহেব ঠিক পাঁচ মিনিট আগে মসজিদে আসেন। এর অন্যথা

করেন না। কখনও একটু আগে চলে আসলে মসজিদের বাইরে দাড়িয়ে সেক্রেটারি সাহেব না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। অন্য কোনো মুছল্লী এসে গেলেও তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে গল্প করেন। ফলে সেক্রেটারি সাহেবের আগে আসাটা আর মিছ হয় না। এতে সেক্রেটারি সাহেব দারুন খুশি হলেন। একদিন বললেন,

— তোমার বেতনটা আগামী মাস থেকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেবো।

এতে ইমাম সাহেবও সেক্রেটারি সাহেবের প্রতি অত্যাধিক খুশি হয়ে গেলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত খুশি আর পাল্টা খুশির পর্ব চলে আসছে। তোষণ নীতিতে ভীষন পদ্ধতি হওয়ার কারণে সেক্রেটারি সাহেবের মন জয় করা ইমাম সাহেবের জন্য কখনও কঠিন হয়না। আজও তিনি সেই পন্থায় অবলম্বন করলেন। সেক্রেটারি সাহেবকে দেখা মাত্র উচু গলায় সালাম দিয়ে বললেন,

— মিয়া সাহেব, অতি উত্তম খবর আছে।

সেক্রেটারি সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন এখনও পাঁচ-সাত মিনিট সময় আছে। অতএব অতি উত্তম খবরটা এখন শোনা যায়। খবরটা শোনার জন্য কান খাড়া করতেই ইমাম সাহেব বললেন,

— আজ রাতে আমি একটা উত্তম স্বপ্ন দেখেছি। যা শুনলে আপনি এমন খুশি হবেন যে তা আর বলার নয়।

সেক্রেটারি সাহেব ধমক দিয়ে বললেন,

— আহা অত ভনিতা না করে কি দেখেছ তা বলনা।

— দেখলাম আপনি একটা উচু পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে আছেন। আর আমরা সবাই পাহাড়ের নিচে দাড়িয়ে আছি। আপনি আমাদের উঠে আসতে বলছেন। কিন্তু আমরা উঠতে পারছি না।

সেক্রেটারি সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— এতে কি বুঝা যায়?

ইমাম সাহেব বললেন,

— এ থেকে বোঝা যায় আপনি এমন স্তরে পৌঁছে গেছেন যেখানে পৌঁছানো আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

কথাটা শুনে সেক্রেটারি সাহেব ফিক করে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন,

— ঠিক আছে তোমার বেতন.....

এতদূর বলতেই ইমাম সাহেব তাকে বাধা দিয়ে বললেন,

— বেতন নয়, এবার আমার অন্য একটা কাজ করে দিতে হবে।

সেক্রেটারি সাহেব ভীষন অবাক হলেন। বেতন ছাড়া অন্য কিছুতে এর কোনো আগ্রহ কোনো দিন ছিলো বলে তিনি জানেন না। কিন্তু আজ সেটা জানলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন,

— কি ব্যাপার!

ইমাম সাহেব বললেন,

— আমাকে এবার ক দিনের ছুটি দিয়ে বাধিত করতে হবে।

কথাটা শুনে সেক্রেটারি সাহেব ভীষন বিরক্ত হলেন। এই ছুটি জিনিসটা একেবারেই পছন্দ করেননা। ইমাম সাহেব ছুটি নিলে মসজিদে আসার মজাটাই থাকে না। তোয়াজ করার কেউ থাকে না। ঠোট বাকা করে তিনি বললেন,

— ছুটি! তা ক দিনের?

ইমাম সাহেব এবার বেশ ফাপড়ে পড়ে গেলেন। ছুটি ক দিনের সেটা স্বপন তাকে বলে দেয় নি। স্বপন বলেছিলো, সে আসলে আলোচনা শুরু করতে। কিন্তু ইমাম সাহেব আগেই শুরু করে দিয়েছেন। আর দিয়েই বিপদে পড়েছেন। এজন্যই বলে, গুরুজনের কথার আগ পেছ করতে নেই। তবে তার বিপদ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। স্বপন তখনই এসে হাজির হলো। আর হাজির হয়েই সে শুনতে পেলো তার বাবা ইমাম সাহেবকে ধমক দিয়ে বলছেন,

— ক দিনের ছুটি বলো।

কথাটা শুনে আর ইমাম সাহেবের পাংশু মুখটা দেখে সে অবস্থা অনুধাবন করতে পারে।

ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে,

— ক দিনের ছুটি বলুন। এই যেমন ধরুন দু-তিন মাস।

ইমাম সাহেব সাথে সাথে বলে উঠলেন,

— জি দু-তিন মাস।

কথা শুনে সেক্রেটারি সাহেব তো অতবাক হয়ে গেলেন।

— এত দিনের ছুটি কি জন্য?

ইমাম সাহেব তড়িঘড়ি করে বললেন,

— আজ্ঞে, আমার স্ত্রীর পেটে বাচ্চা।

সেক্রেটারি সাহেব ভারী গলায় বললেন,

— তোমার স্ত্রীর পেটে বাচ্চা তো তুমি ছুটি নেবে কেনো? নামাজ কি তুমি পড়াও না তোমার স্ত্রী?

স্বপন তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করে।

— উনার স্ত্রীর পেটে টিউমার হয়েছে, আব্বা।

কথাটা শুনেই ইমাম সাহেব ঘন ঘন মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে বলেন,

— হ্যা হ্যা।

সেক্রেটারি সাহেব চোখ কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বলেন,

— আস্ত একটা গাধা। পেটে হয়েছে টিউমার আর বলছে পেটে বাচ্চা। তো টিউমার হলেও এত দিনের ছুটি লাগবে কেনো?

স্বপন ইশারায় ইমাম সাহেবকে এই প্রশ্নের উত্তর মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। মুখে বলে,

— ঐ যে বিদেশ।

ইমাম সাহেব সাথে সাথে বলে উঠলেন,

— আজ্ঞে, বিদেশি টিউমার।

বিদেশী টিউমারের কথা শুনে সেক্রেটারি সাহেবের চোখ চড়ক গাছে উঠে গেলো। ছুটিটা তিনি প্রায় বানচাল করেই দিচ্ছিলেন। কিন্তু স্বপন বিষয়টা সামলে নিলো। তড়িঘড়ি করে সে বলল,

— চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে উনাকে বিদেশে যেতে হবে। ছুটিটা উনার খুবই দরকার। না হলেই নয়।

সেক্রেটারি সাহেব এমনিতে ছুটি মঞ্জুর করতেন না। কিন্তু স্বপনকে বারবার সুপারিশ করতে দেখে তার মনটা গলে গেলো। বউ পালানো ছেলেটার কথা তিনি ফেলতে পারলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন,

— দু তিন মাস পর কিন্তু ঠিক সময়ে মসজিদে হাজির হবে।

ইমাম সাহেব জোরে জোরে মাথা ঝাকিয়ে বললেন,

— ঠিক সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই হাজির হয়ে যাব।

এভাবে তার অভিনয়ের সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি হয়ে গেল।

ইতোমধ্যে স্বপন আরও কিছু ব্যবস্থা সেরে ফেলে। পুরা নাটকটা সাজানোর জন্য তার এমন একটা লোকের দরকার ছিল যে ইমাম সাহেবকে নিজের মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিয়ে এই নাটকের মেয়ের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হবে। এমন একটা লোকের সন্ধান স্বপন আগেই করে রেখেছিল। লোকটা তার বাবার পুরনো বন্ধু। বাবার বন্ধু হলেও স্বপনের সাথে তার সম্পর্কটা ছিল তার বাবার চেয়েও বেশি গভীর। এর একটা কারণও অবশ্য ছিল। লোকটা যাত্রাপালায় অভিনয় করতো। স্বপনদের বাড়ি আসলে নেচে-গেয়ে কৌতুকের অভিনয় করে এমনভাবে মানুষকে হাসাতো যে, তার পাশ থেকে ছেলে মেয়েদের ভীড় কখনও কমতো না। স্বপনও তার পেছ লাগা হয়ে থাকতো সবসময়। তার সাথে যাত্রাপালা দেখতেও গিয়েছে মাঝে মাঝে। সেই সম্পর্কের সুবাদে আর অভিনয়ের প্রতি সহজাত আগ্রহের কারণে এমন একটা লোভনীয় নাটকের প্রস্তাব তিনি ফেলতে পারলেন না। এক্ষেত্রে আরও একটা সুবিধা পাওয়া গেল। তার একটা মেয়ে ছোট কালে যাত্রাপালা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। সে খবর তার

গ্রামের অনেকেই জানে। সেই মেয়েটা বড় হয়ে বাড়ি ফেরত এসেছে এমন দাবি করলে গ্রামের কেউ কোন সন্দেহ করবে না।

এভাবে নাটক মঞ্চায়ন করার সব ব্যবস্থাই চূড়ান্ত হয়ে গেল। ইমাম সাহেব বউটাকে বাপের বাড়ী রেখে স্বপনের সাথে রাতের অন্ধকারে চলে গেলেন সেই লোকটির বাড়ি। তার নাম মাজু মিয়া। মাজু মিয়া যাত্রার লোক। মেকআপ করে কলাগাছকেও বউ সাজিয়ে দিতে ওস্তাদ। প্রথমেই তিনি ইমাম সাহেবের দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে নিলেন। পরে দশ টাকার ছাই মাজনের পুরা একটা বোতলই ঢাললেন তার লাল দাত গুলোর উপর। সেগুলো রুপোর মত চকচকে করে তাই ছাড়লেন। সব শেষে অভিনয়ের মেকআপ ব্যবহার করে ইমাম সাহেবকে তিনি পুরা মহিলা সাজে সাজিয়ে দিলেন। পরে ইমাম সাহেব আয়নায় নিজেকে দেখে সে কি হাসি! তিনি নিজেই নিজেকে আর চিনতে পারছেন না। সাজগোজ শেষ করে মাজু মিয়া ইমাম সাহেবকে বললেন, তোমার নাম হবে নাজু। ইমাম সাহেব নাক সিটকিয়ে বললেন,

— নাজু! এ কেমন নাম?

লোকটা ধমক দিয়ে বললেন,

— কেমন নাম মানে! এটা আমার হারিয়ে যাওয়া মেয়ের নাম। পুরা নাম নাজমা খাতুন। সংক্ষেপে নাজু। এই নাম না হলে গ্রামের লোক সন্দেহ করবে যে।

স্বপন ভারি গলায় বলল,

— ঐ নামই হবে।

তারপর ইমাম সাহেবের দিকে চোখ কটমট করে তাকালো। স্বপনকে রেগে যেতে দেখে ইমাম সাহেব তড়িঘড়ি করে বললেন,

— জি, জি। ওতেই হবে। নাজু কেন আপনি আমাকে লেজু বললেও আমার কোন আপত্তি নেই।

লোকটা নরম গলায় বললেন,

— আচ্ছা ঠিক আছে। এবার তোমাকে কি করতে হবে শোনো। আজ আমাদের নাটকের প্রথম পর্ব শুরু হবে।

ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— আজই!

মাজু মিয়া বললেন,

— আজই নয়। এখনই।

তারপর তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে উঠানের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর তার দুটি হাত ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

— ওরে আমার নাজু রে। আজ ফিরে এলি রে। তোর মা বেঁচে থাকলে কি যে খুশি হতো রে।

সত্যিই লোকটা অভিনয়ে একেবারে পাকা। তার কান্না কাটি শুনে পাড়ার লোকেরা সব জড় হয়ে গেল। মাজু মিয়া তার মেয়ের হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী থেকে শুরু করে এতদিন সে কোথায় ছিল আর এখন কিভাবে ফিরে এলো ইত্যাদি সব কাহিনীই তাদের রসিয়ে রসিয়ে শোনালেন। শুনে তারা সবাই তাজ্জব বনে গেলো। গ্রামের মুরুব্বিরা বলল,

— বুড়োটার সত্যিই ভাগ্য ভালো। ছোট মেয়ে হারিয়ে গেল আর ডাঙর হয়ে ফিরে এলো।

তারা কেউই কোন সন্দেহ করল না। এভাবে নাটকের প্রথম পর্ব সফলতার সাথে শেষ হলো। সে রাতেই স্বপন বাড়ি ফিরে এলো। বাকী কাজের দেখভাল মাজু মিয়া নিজেই করবেন। তাকে সে সব কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

চার.

সুমি ডিভোর্স দেওয়ার পর থেকে স্বপনদের বাড়িতে ক্রমাগত ঘটক যাওয়া আসা করতে লাগল। ছেলেকে দ্রুত বিয়ে দিয়ে বাজিমাত করে দেওয়ার জন্য স্বপনের বাবা-মা উঠে পড়ে লেগেছে। বউ পালিয়ে গিয়ে মিয়াদের মুখে যে চুনকালি লেগেছে তা ধুঁয়ে মুছে সাফ না করা পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই। তাই ছেলেকে যত দ্রুত সম্ভব আবার বিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তবে ঘটক যাওয়া আসা করছিল ঠিকই বাবার কিছু

পর্যাপ্ত খরচা হচ্ছিল কিন্তু বিয়েটা সম্পাদন করা যাচ্ছিল না কিছুতেই। যে সম্বন্ধই আসে একটা বউ পালিয়ে গেছে শুনে ফিরে যায়। বিয়েতে রাজী হয় না। এমন এক পরিস্থিতিতে একদিন স্বপনের বাবার সাথে বাজারে দেখা হয়ে গেল মাজু মিয়া। দু বন্ধুতে আলোচনা জমে উঠতেই মাজু মিয়া নিজের মেয়ের ফিরে আসার ঘটনাটা বন্ধুকে শুনালেন। এখন যে মেয়েটাকে বিয়ে দেওয়া দরকার কথা প্রসঙ্গে সেটাও উল্লেখ করলেন। সেক্রেটারী সাহেবের চট করে কথাটা মনে ধরে গেল। তিনি বললেন,

— তবে আর বাইরে কেন? আমারই তো ছেলে রয়েছে ঘরে। তোর মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিই।

কথা শুনে মাজু মিয়া জোর করে আনন্দ চেপে রেখে বললেন,

— কিন্তু তোর ছেলে তো শুনলাম আধ পাগল।

কথা শুনে সেক্রেটারী সাহেব যেন চমকে উঠলেন। বললেন,

— সে কি কথা! অমন সুপুরুষ ছেলে আমার আধ পাগল হবে কেন।

মাজু মিয়ে একটু টেনে বললেন,

— সুপুরুষ ছেলের কি আর বউ পালিয়ে যায়?

সেক্রেটারী সাহেব এবার পুরা চুপ হয়ে গেলেন। বউটা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে ছেলেটার নামে এমন বদনাম তাকে প্রায়ই শুনতে হচ্ছে। এখন বোঝা যাচ্ছে কথাটা গ্রাম ছাড়িয়ে ভিন গ্রামে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কোনো রকমে ধাক্কাটা সামলে তিনি বলেন,

— বউ যদি সখ করে পালিয়েই যায় তবে সে দোষ কি আর ছেলের?

মাজু মিয়া মজা করে বললেন,

— তোর বেটার বউ তাহলে সখ করে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে? হায় আল্লাহ! মানুষের সখ আহলাদ এ যুগে যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে!

তারপর সেক্রেটারী সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,

— তাহলে বলছিস তোর ছেলে আধ পাগল নয়?

সেক্রেটারী সাহেব প্রচলিত জোরে মাথা নেড়ে বলেন,

— মোটেও নয়।

মাজু মিয়া ভীষণ খুশি হওয়ার ভান করে বলেন,

— তাহলে তো আর কোন সমস্যাই নেই। তোর ছেলের সাথেই আমার মেয়ের বিয়ে হবে। এতে আর আপত্তির কি আছে? তাহলে তোর বউকে নিয়ে একদিন আয় আমার বাড়িতে।

সেক্রেটারী সাহেব তাতে রাজী হলেন। দিনক্ষণও ঠিক করে ফেললেন। পরে তার বিবিকে সাথে করে মেয়ে দেখলেন। মেয়ে দেখে তারা তো ভীষণ খুশি। স্বপনের মা বললেন,

— আহা কি সুন্দর ফর্সা রঙ মেয়েটার!

তারপর তার খুতনিতে হাত রেখে বারবার চুমা খেতে লাগলেন। আর বলতে থাকলেন,

— সুখি হও মা।

ইমাম সাহেব ভাবলেন এমন মমতাময়ী মা কি কখনও বেটার বউয়ের উপর জুলুম করতে পারে? সবই ঐ গোন্ডা ছেলেটার বানানো মিথ্যা কথা।

মেয়ে দেখার পর কথা-বার্তা হলো। মাজু মিয়ার এক কথা,

— মেয়ে যদি সুখে থাকে তবে বিয়েতে আমার অমত নেই।

সেক্রেটারী সাহেব আর তার বউ বার বার কিরে-কসম করে বললেন,

— মেয়ে অবশ্যই সুখে থাকবে।

সেই মতে বিয়ের দিনক্ষণ, মোহরানা সব ঠিক হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে বিয়েও হয়ে গেল। বাসর রাতে স্বপন ইমাম সাহেবকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিল। শাশুড়িকে মা বলতে হবে। শ্বশুরকে আব্বা। ননদকে বলতে হবে আপা ইত্যাদি। নতুন বউ হিসেবে ক’দিন ইমাম সাহেবের বেশ ভালই কাটলো।

কোনো কাজে হাত দেওয়া লাগে না। সারাদিন কেবলই স্বামীর সাথে বসে গল্প করা

আর ভাল-মন্দ খাবার খাওয়া। দুধ, কলা, ডিম, দই, মিষ্টি, পোলাউ, মাংস, ইত্যাদি নানা রকমের খাবার সামনে আসতে লাগল। তিনি খেলেনও খুব। এমনিতেই ইমাম হিসেবে তার খোরাক বেশি। তার উপর আবার আরামে বসে বসে পা দুলিয়ে খাওয়া। জীবনটা যেন তার জাল্লাতে পরিণত হলো। মনে মনে তিনি ঠিক করলেন, স্বপনের যদি আপত্তি না থাকে তবে সারাটা জীবন তার বউ হয়েই কাটিয়ে দিবেন। স্বপনকে কথাটা বলতেই সে বলল,

— একটু ধৈর্য্য ধরুন। খুব শীঘ্রই মজাটা টের পাবেন।

মিষ্টি-পোলাউয়ের বাইরে আবার কি মজা হতে পারে তাই ভেবে ইমাম সাহেব স্বপনের কথাটা মোটেও আমলে নিলেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো। প্রথম দিকে তার শাশুড়ি রান্না-বাড়া করতেন। ধীরে ধীরে সে দায়িত্বটা তার উপরে এসে পড়ে। তাতেই অবশ্য তিনি খুব একটা বিচলিত হলেন না। রান্না-বাড়া করার অভ্যাস তার আছে। মাদ্রাসায় যখন পড়তেন বাবুর্চি না থাকলে মাঝে মাঝে তাকেই রান্না করতে হতো। তার রান্না খেয়ে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সবাই দারুন প্রশংসা করতো। ইমাম সাহেব মনে মনে ভাবলেন, এখানেও তিনি রান্না করে সবাইকে চমকে দেবেন। প্রথম দিন খুব যত্ন করে রান্না-বাড়া করলেন। তারপর খাওয়ার টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন প্রশংসা শোনার জন্য। সেক্রেটারী সাহেব প্রায় প্রশংসা করেই ফেলেছিলেন। খাবার মুখে দিয়েই তিনি বলে উঠলেন,

— বাহ! খুব

এতদূর বলতেই স্বপনের মা চিৎকার করে উঠলেন,

— ছি! ছি! কি বাজে রান্না! একি মানুষে খায়?

সাথে সাথেই স্বপনের বোন তার সাথে গলা মিলালো। কথা শুনে ইমাম সাহেব ভীষণ আশাহত হলেন। এতকষ্ট করে রান্না-বাড়া করলেন আর তার পরিণাম হলো এই? সেক্রেটারী সাহেবের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

— বাবা, আপনি যেন কি বলতে চাচ্ছিলেন।

সেক্রেটারী সাহেব খতমত খেয়ে বললেন,

— কই না তো।

ইমাম সাহেব তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন,

— ঐ যে বললেন বাহ! খুব। তারপর থেমে গেলেন।

সেক্রেটারী সাহেব ভয়ে ভয়ে একবার তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন,

— আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, খুব বাজে রান্না হয়েছে।

ইমাম সাহেব এবার স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন,

— আপনি কি বলেন?

স্বপন নরম গলায় বলল,

— মা বাবা হলো আমার গুরুজন। তারা যা বলছে তার বিরুদ্ধে আমি আর কি বলবো।

ইমাম সাহেবের মুখটা এবার পুরাই শুকিয়ে গেল। তিনি মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন।
রাতেই স্বপনকে তিনি তার কষ্টের কথা জানালে স্বপন মুচকি হেসে বলে,

— এই সামান্য ব্যাপারে আপনি এতো কষ্ট পাচ্ছেন কেন?

ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন,

— এটাকে আপনি সামান্য ব্যাপার বলছেন! আমি এতকষ্ট করে রান্না-বাড়া করলাম আর
খাওয়ার সময় সবাই মিলে কেবলই নিন্দা-মন্দ করলো! এটা এক প্রকার নেমকহারামী।
এ কারণেই রাসূল ﷺ বলেছেন, খাবারের দোষ ধরতে নেই।

ইমাম সাহেবের মুখে হাদিসটি শুনেই স্বপন যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। প্রথমেই
পটাম পটাম হাততালি দিয়ে বলে উঠল,

— সাবাস, সাবাস। এই তো ওষুধে কাজ করছে মনে হচ্ছে। আপনার মুখ দিয়ে বেটার
বউদের পক্ষে হাদিস বের হচ্ছে। অত্যন্ত সু-খবর।

তারপর ধুসমুছ করে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে একটা বাঁধাই করা খাতা বের করে নিয়ে
আসলো। খাতাটার মোলাটের উপরে লেখা ‘বেটার বউদের দলিলনামা’। স্বপন খাতাটা
খুলেই কলম দিয়ে খস খস করে লিখল, এক নম্বর হাদিস, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

খাবারের দোষ ধরতে নেই।

তারপর ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে চোখ গোল্লা গোল্লা করে বলল,

— এই হাদিসটা গত পাঁচ বছরের মধ্যে একটি বারের জন্য কি আপনার মনে পড়েনি? শাশুড়িরা বেটার বউদের রান্না-বাড়া ও অন্যান্য কাজের অকারণে নানা রকম খুঁত ধরে সে কথা তো আপনি জানতেন। আমি নিজেও আপনাকে বলেছি। তখন তো আপনি আমাকে হাদিসটা শোনাতে পারতেন। জুমার খুতবায় হাদিসটা পাঠ করে শাশুড়িদের এই কাজ থেকে নিষেধ করতে পারতেন।

ইমাম সাহেব মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন,

— তখন তো হাদিসটা আমার মনে পড়েনি।

স্বপন মাথা নেড়ে বলে,

— মনে পড়েনি নয়, বরং বলুন, প্রয়োজন পড়েনি।

দুটো বিষয়ের মধ্যে ইমাম সাহেব কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলেন না। তার কাছে মনে হলো দুটি বিষয় একই। কারণ, যে জিনিসটা তার প্রয়োজন পড়ে সেটা মনে পড়ে।

তার পিঠে আঘাত করে বাহবা দিয়ে স্বপন বলে,

— চালিয়ে যান। আপনিই পারবেন বেটার বউদের চরম জুলুম-নির্যাতন থেকে উদ্ধার করতে।

ইমাম সাহেব ঠোঁট বাকিয়ে বললেন,

— উদ্ধার করবো কি? আমি নিজেই তো পড়ে গেছি শাশুড়ির জালে।

হালকা হেসে স্বপন বলে,

— একারণেই তো আমি আপনাকে বেটার বউ সাজিয়ে রেখেছি। আপনি নিজে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যেসব হাদীস ব্যবহার করবেন আমি সেগুলো লিখে রাখবো। পরে সেগুলো দিয়ে আপনি বই লিখবেন। দুনিয়ার সকল বেটার বউ সেই সব হাদীস ব্যবহার করবে শাশুড়ির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। ঐ বইটার নাম হবে আপনার নামে। লেখকও হবেন আপনি।

নিজের নামে বই হবে শুনে ইমাম সাহেব বেশ আগ্রহবোধ করেন। মাদ্রাসায় পড়ার সময় বক্তা হওয়ার মতই মুসান্নেফ হওয়ার সখও তার ছিল। বড় বড় লেখকদের আরবীতে মুসান্নেফ বলে। কপাল দোষে বক্তা তিনি হতে পারেন নি, এখন যদি একটা বই লিখে মুসান্নেফ হওয়া যায় তবে মন্দ কি? তিনি ভীষণ আগ্রহী হয়ে বললেন,

— বইটার নাম কি হবে?

স্বপন হাসি চেপে রেখে বলে,

— বিবিজান হুজুর আকবার আলীর আত্মকথা।

ইমাম সাহেব নামটি শুনে দো'টানায় পড়ে গেলেন। বইয়ের নামে তার নাম জোড়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিবিজান খেতাবটির তিনি মানে বুঝলেন না। পূর্বে তিনি আম্মাজান হুজুর কথাটা শুনেছেন, নিজেও এই খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু বিবিজান হুজুর কথাটি তিনি কখনও শোনেননি। বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,

— বিবিজান হুজুর!

স্বপন তাকে বুঝিয়ে বলে,

— এই যে আপনি আমার বিবি হয়ে ক'টা দিন কাটালেন বলেই তো এখন আপনার হারানো বিদ্যা উদ্ধার হচ্ছে। সেই বিদ্যা দিয়ে আপনি একটা বই লিখবেন আর আপনার এই অবস্থার কথা সেই বইয়ের নামে লেখা থাকবে না তা কি হয়? বিবি সেজে আপনি এতো কষ্ট করছেন। পাঠকরা সে খবরটাই যদি না জানে তাহলে আপনার কষ্টের কি আর দাম হলো?

ইমাম সাহেব এবার বিষয়টা অনুধাবন করতে পারেন। এখন তার কাছে মনে হচ্ছে নামটা ঠিকই আছে। তিনি মনে মনে ভাবেন, এই বই যদি ভাল মার্কেট পায় তাহলে তিনি বিখ্যাত হয়ে যাবেন। যে কোনো একভাবে বিখ্যাত হলেই হলো। বই প্রকাশের খবর শুনে তিনি তাই খুব খুশি হলেন। তার সব কষ্ট যেন ধূলায় মিশে গেল। কিন্তু পরদিন থেকেই আবার শুরু হলো কষ্ট। যে কোন কাজে শাশুড়ি ভুল ধরে। উঠোন ঝাড়ু দিলে খুজে খুজে দেখেন কোথাও একটু ময়লা পড়ে আছে কি না? তারপর সেদিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে,

— এই যে জমিদারের বেটী। এমন উঠোন ঝাড়ু দেওয়া কোথায় শিখেছো?

ইমাম সাহেব তড়িঘড়ি করে সেখানে দৌড়ে গিয়ে আবার ঝাড়ু দিয়ে দেন। রান্না-বান্নারও ভুল ধরা হয় প্রতিদিন, প্রতিবেলায়। আজ লবণ কম তো কাল হয় বেশি। লবণ ঠিক থাকলে ঝাল বেশি। ঝাল ঠিক থাকলে ঝোল বেশি ইত্যাদি নানা রকমের ভুল-ভ্রান্তি ধরতে থাকে তার শাশুড়ি। রান্নার ক্লাসে তিনি যে কত ক্লাস পাশ তা কেবল তিনিই জানেন। ইমাম সাহেব চোখ-কান বুজে সব সহ্য করে যান। কারণ স্বপ্ন কড়া ভাবে বলে দিয়েছে,

— বেটার বউদের যেমন যেমন করতে বলতেন নিজেও তেমন সহ্য করতে না পারলে কিন্তু গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলব।

সেই ভয়েই ইমাম সাহেব সব কষ্ট সহ্য করেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু একদিন ভাবলেন শাশুড়িকে একটা হাদীস শুনিয়ে দেখবেন, যদি কাজ হয়। তিনিও তো মুসলমানের ঘরের মেয়ে। এমন ভেবে খাবারে দোষ না ধরার হাদীস যেই না বলেছেন অমনি তার শাশুড়ি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার দিকে তেড়ে আসলেন। তারপর বাঁদড়ের মত লাফাতে লাফাতে বললেন,

— ঐ হারামজাদি, আমাকে হাদীস শেখানো হচ্ছে। ওরে কে কোথায় আছিস দেখে যা। পীর সাহেবের মেয়ে এসেছে আমাদের বাড়ীতে। ওরে আমার হাদীসওয়ালী রে। তোর বাপ-দাদার চৌদ্দগোষ্ঠীর চেয়ে আমি বেশি হাদীস জানি।

সেই সাথে এমন এমন ভাষায় গালাগাল দিতে লাগলেন যে, তা একই সাথে অকথ্য ও অলেখ্য। তারমধ্যে বেজাতী, বেজন্মা, ছোট লোকেরা বাচ্চা ইত্যাদি শোভন গালাগালিও ছিল। শাশুড়ির হাঁক ডাক শুনে পাড়া প্রতিবেশিরা এসে জড় হলো। ইমাম সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, তারা কেউই তার শাশুড়িকে কিছুই বলল না। উল্টো সবাই তাকেই চেপে ধরলো। সবাই একত্রে সেই কথাটি বলল, যা তিনি নিজে এতদিন জুম্মার খুতবায় বলে এসেছেন। তারা বলল,

— শ্বশুর-শাশুড়ি হলো গুরুজন। তারা কিছু আজেবাজে বলতেই পারে। গুরুজনের মুখের গালি হলো আশির্বাদ। তাদের মুখের উপর কথা বলা বা তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

ইমাম সাহেব বিনিতভাবে বললেন,

— আমি তো কোন তর্ক-বিতর্ক করিনি। আমি কেবল একটা হাদীস শুনিয়েছি।

হাদীস শোনানোর কথা শুনে সবাই যেন বেশ একটু অবাক হলো। বউ শাশুড়ির ঝগড়ার মধ্যে বেটার বউয়ের মুখে হাদীস শোনানোর বিষয়টা তাদের কাছে যেন বেমানান লাগে। এতদিন ধরে তারা কেবল শ্বশুর-শাশুড়ির পক্ষেই হাদীস শুনে আসছে। বেটার বউয়ের পক্ষে যে কোন হাদীস থাকতে পারে তা তারা জানেই না। এক বুড়ো তো আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বলল,

— হাদীস দিয়ে কি আর শাশুড়ির সাথে পারা যায়? হাদীস তো সব শ্বশুর-শাশুড়ির পক্ষেই। আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের মুখেই কখনও বেটার বউদের পক্ষের হাদীস শুনলাম না আর তুমি তো কোন সার!

ইমাম সাহেব বুঝতে পারেন তিনি নিজের হাতে যে কুয়ো এতদিন ধরে কেটেছেন স্বপন তাকে সেই কুয়োই এনে ফেলে দিয়েছে। এখন তার মুক্তি পাওয়ার উপায় একটাই। ঐ কুয়ো আবার বুজিয়ে দেওয়া। বেটার বউয়ের পক্ষে যত হাদীস আছে তা খুঁজে বের করে স্বপনকে বুঝিয়ে দিলেই কেবল তার মুক্তি হতে পারে। তাছাড়া সমাজের লোকদের সম্মিলিত জুলুম-নির্যাতনের মুখে একজন বেটার বউ যে কতটা অসহায় সেটাও তিনি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। অস্থায়ী ভাবে হলেও তিনি নিজেও এখন বেটার বউদের দলেই আছেন। তাই তাদের দুঃখে তার মনটা হু-হু করে কেঁদে ওঠে। এই কান্না অবশ্য তার মোনাজাতের কান্নার মত অভিনয় নয়। সত্যিকারের কান্না। তাই মনে মনে তিনি দৃঢ় সংকল্প করেন। এ ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবেন না। রাতে স্বপনের নিকট দিনের সব ঘটনা বর্ণনা করার পর ইমাম সাহেব বললেন,

— এতকিছুর মধ্যে একটা কথা আমার খুব মনে লেগেছে জানেন?

স্বপন চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

— সেটা কি?

ইমাম সাহেব প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন,

— আপনার মা আমাকে বেজাতী, বজ্জাত, ছোট লোকের বাচ্চা ইত্যাদি নানা ভাষায়

গালাগাল করল। আমার বাবা গরীব মানুষ ছিলেন ঠিকই কিন্তু ছোটলোক ছিলেন না। তিনি বেজাত বা বেধর্মীও ছিলেন না। বরং অত্যন্ত নেককার ও ইমানদার ব্যক্তি ছিলেন। তাই তো আমাকে মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন, যাতে আমি তার মত হতে পারি। আমি অবশ্য তার মতো হতে পারিনি কিন্তু সে দোষ আমার। তাই বলে তার জন্য আমার বাবা-মাকে টেনে এনে গালাগালি করার হেতুটা কি?

ইমাম সাহেবের কথা শুনে স্বপনের দু'টি চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তার সুমির কথা মনে পড়ে। তার মা তাকেও এসব ভাষাতেই গালাগাল করতেন। সে নিশ্চয় আরও বেশি কষ্ট পেত। যেহেতু মেয়েদের মন একটু বেশিই নরম হয়। সেকারণেই বুঝি সে এসব গালাগাল শুনে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলত। ইমাম সাহেব আর যাই হোক এখনও তো কেঁদে ফেলেন নি।

স্বপনের নরম নরম ভাবটা দেখে ইমাম সাহেব বলেন,

— জানেন? গালাগাল শুনে আমার কি মনে হচ্ছিল?

স্বপন সজল চোখে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে মাথার ইশারায় বলেন,

— কি?

ইমাম সাহেব বলেন,

— আমার মনে হচ্ছিল, গাল গুলো আমার বাবা-মায়ের কবরে গিয়ে তাদের হাড়ের উপর ঠকাস ঠকাস করে আঘাত করছে।

কথাটা শুনে স্বপন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। তার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। ইমাম সাহেব বলতে থাকলেন,

— অথচ কি আশ্চর্য ব্যাপার! পাড়ার একটা লোকও আমার পক্ষে কথা বলল না!

স্বপন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,

— এখন বুঝতে পারছেন? এ সমাজে একটা বেটার বউ কত অসহায়! তাদের পক্ষে সমাজের লোক যেমন কথা বলে না মোল্লা-মৌলভীরাও তাদের পক্ষে কোন হাদীস বলে না। অনেক সময় বেটার বউরাও শাশুড়িদের উপর জুলুম করে। তখন কিন্তু কেউ তাকে

ছেড়ে কথা বলে না। সমাজের লোক, মোল্লা-মৌলভি সবাই তখন একযোগে বেটার বউকে এক ছি, হাজার ছি করে। সমাজের দোষেই অনেক বেটার বউকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়। কিন্তু বেটার বউদের অত্যাচারে শাশুড়ি আত্মহত্যা করেছে এমন খবর শোনা যায় না।

ইমাম সাহেব আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসেন। জাত তুলে গালি দেওয়ার বিষয়টি তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন,

— রাসুল ﷺ বলেছেন, বংশ বা জাত তুলে গালি দেওয়া কুফরি।

স্বপনের চোখ দু'টো জলজল করে ওঠে। ইমাম সাহেব আরও একটা হাদীস বলেছেন। বেটার বউদের পক্ষের হাদীস। স্বপন তাড়াতাড়ি তার খাতাটা বের করে হাদীসটা লিখে নেয়। নিজের মুখ দিয়ে আরও একটা হাদীস বের হতে দেখে ইমাম সাহেব নিজেও খুশি হলেন। মনে মনে তার জিদ উঠে যায়। তিনি ভাবেন, স্বপনের খাতাটা হাদীস দ্বারা ভরিয়ে দেবেন। এখনি অবশ্য তার সব হাদিস মনে পড়ছে না তবে এক একটা ঘা খাওয়ার সাথে সাথে একটা হাদীস মনে পড়ে যাবে। ব্যাপারটা অনেকটা বাংলা সিনেমার নায়কদের লাঠির আঘাতে স্মৃতিশক্তি ফিরে পাওয়ার মত। যাই হোক, এভাবেও যদি কিছু ভুলে যাওয়া বিদ্যা তার স্মরণ হয়ে যায় তবে খারাপ কি?

ধীরে ধীরে অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকলো। অবস্থা এমন দাড়ালো যে তা বলতেও লজ্জা লাগে। ইমাম সাহেব একদিন মাংস রান্না করার সময় মাংসের ছোট একটা টুকরা হাতে নিয়েছেন চেখে দেখার জন্য। তার শাশুড়ি হয়তো আশপাশ থেকে আড়ি পেতে তার উপর নজর রাখছিল। মাংসের টুকরাটা হাতে নেওয়ার সাথে সাথে কোথা থেকে ছুটে এসে ছোঁ মেরে সেটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হাড়িতে ফেলে দিয়ে বলল,

— হাভাতেদের মত রান্নার সময় চাখতে চাখতে সব মাংস শেষ করে ফেলবে নাকি?

তারপর চামচে করে একফোটা ঝোল ইমাম সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন,

— চাকতেই যদি হয় এটুকু চাকো।

ইমাম সাহেব করুন দৃষ্টিতে হাতের ঝোলটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। এটুকু ঝোলে তার জিবে হয়তো একটু ছেঁকা লাগবে। কিন্তু ঝাল-লবণ চাখা হবে না। তাছাড়া এভাবে

হাত থেকে মাংসের টুকরোটা কেড়ে নেওয়াতে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। পাঁচ বছরের ইমামতির জীবনেও সভাপতি-সেক্রেটারীর হাতে তিনি এত বড় অপমান হননি। আপনা আপনি তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো। ঝোলটুকু আর চেখে দেখা হলো না। শাশুড়ি চলে গেলে হাতটা শাড়ীতে মুছে তিনি রান্না চালিয়ে গেলেন। মনে মনে কেবলই ভাবলেন কয়েক দিনের জন্য বেটার বউয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে এসে তাকে এমন দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাহলে যারা স্থায়ী ভাবে এসব শাশুড়িদের সাথে সংসার করে তাদের অবস্থা কি হয়! এখন সত্যি সত্যিই বেটার বউদের জন্য তার খুব মায়া হয়।

এখানেই শেষ নয়। এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত মাছের কাটা-চোকরা আর মাংসের হাড়-গোড়ই কেবল তার ভাগ্যে জোটে। এমনকি মাঝে মাঝে তার কথিত পিতা মাজু মিয়া যে সব মাছ বা মুরগি নিয়ে তাকে দেখতে আসে সেগুলোর কলিজা ও অন্যান্য মজাদার অংশ চলে যায় স্বামী ও দেবর-ননদদের পাতে। কেবল যেসব জিনিস এমনিতেই ফেলে দিতে হয় সেগুলো পড়ে থাকে তার জন্য। কেবল প্রথম কয়েকদিন একটু ভাল খাবার খেয়েছেন। তারপর থেকে অবস্থা একই রকম। কেবল মাছ-মাংস নয় পেট ভরে ভাত খাওয়াতেও শাশুড়ির আপত্তি। ইমাম হিসেবে সারা লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে এমনিতেই ইমাম সাহেবের জিব লম্বা হয়ে গিয়েছিল। তার উপর সারা খাটুনী করে তার ক্ষুধাটাও যেত বেড়ে। তাই যাহোক একটা তরকারি দিয়ে অনেক বেশি ভাত খেয়ে ফেলতেন। একদিন দেখলেন, খাওয়ার সময় শাশুড়িটা আড় চোখে বারবার তার থালার দিকে তাকাচ্ছে। ইমাম সাহেব ভাবলেন, তার পাতে মাছের কাটা-চোকরা গুলো দেখে হয়তো শাশুড়ির মনে মায়া-দরদ উতলে ওঠছে। এখনই হয়তো একটা বড় সাইজের মাছের টুকরো তুলে তার পাতে দিয়ে বলবেন,

— নে মা খা। অন্তত আজকের দিনটা মন ভরে খা।

কিন্তু তেমন কিছু হলো না। তবে শাশুড়ির তাকিয়ে থাকার রহস্য পরে জানা গেল। একদিন ইমাম সাহেব দেখলেন তার শাশুড়ি পাড়ার একটা মেয়ের সাথে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা বলছে। তার বুকের ভিতরটা খচ করে উঠল। জানা কথা যে, আলাপটা তাকে নিয়েই হচ্ছে। তিনি এ বাড়িতে আসার পর থেকে তাকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে তার শাশুড়ি আলোচনা করেছেন বলে তার জানা নেই। তার নামে কি বদনাম করা

হচ্ছে সেটা জানার জন্য তার মনটা উদগ্রীব হয়ে উঠল। একটা ঝাটা নিয়ে ঝাড়ু দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি সেদিকে গিয়ে আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করলেন। তিনি শুনলেন শাশুড়ি বলছে,

— কি বলবো বোন। বউটা একটা আস্ত রান্ধস। এক গামলা করে ভাত সাবাড় করে।

শুনে পাড়ার মেয়েটি চোখ কপালে তুলে বলল,

— তাই নাকি! বউ মানুষের অত খেতে নেই বাপু।

কথা শুনে ইমাম সাহেবের দু'জনের উপরই রাগ হলো। সেই সাথে ঘেন্নায় তার গা গুলিয়ে উঠল। ইচ্ছা হলো এতদিন এ বাড়ির যা কিছু খাবার খেয়েছেন তা বমি করে তুলে দেবেন। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়। তাই তিনি মনের রাগ মনেই চেপে রাখলেন। তবে তার পর থেকে তিনি খাওয়া দাওয়া অনেক খানি কমিয়ে দিয়েছিলেন। ভাতের সামনে বসলেই তার ঐ কথাটা মনে পড়ে ভীষণ ঘেন্না হতো। জান বাঁচানোর মত অল্প একটু খেয়েই উঠে পড়তেন। শাশুড়ির ভাব দেখে মনে হতো এতেও তিনি খুশি নন। খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেই বুঝি তার ভাল হয়। এ নিয়ে ইমাম সাহেবের একটা হাদীস মনে পড়লো। রাসুল ﷺ বলেছেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খাবারও দেয়নি আবার ছেড়েও দেয়নি যাতে নিজের খাবারের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারে। এভাবে বিড়ালটি মারা যায়। একারণে ঐ মহিলা জাহান্নামী হবে। ইমাম সাহেব ভাবেন,

— স্বপনের মায়ের অবস্থা তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। তিনি কাজ-কর্ম করার জন্য এ বাড়িতে তাকে আটকে রেখেছেন। বাবার বাড়িতে বেশিদিন থাকতে দেন না। আবার পেট ভরে খেতেও দেন না। ধরে বেঁধে মারা ছাড়া একে আর কি বলা যায়!

স্বপনকে হাদিসটা বলতেই সে খাতায় তা লিখে নিল। ইতোমধ্যে একদিন মাজু মিয়া আসলেন মেয়েকে দেখতে। সাথে নিয়ে এলেন দই, মিষ্টি আর বড় একটা রুই মাছ। এসবের খরচ অবশ্য স্বপনই বহন করে। এতো দিনে বাবা-মার অগোচরে কিছুটা খরচ করা শিখিছে সে। প্রথম দিকে সে কোন খরচ দিত না। তাই মাজু মিয়া খালি হাতে আসতেন। তার তো আর নিজের মেয়ে নয় যে তিনি নিজের টাকা খরচা করবেন। এভাবে খালি হাতে আসার কারণে তিনি চলে যাওয়ার পর পরই ইমাম সাহেবকে নানা

কটু কথা শুনতে হতো। ফকিরের বাচ্চা, ছোটলোক, জনমের ভিখারী, এক টুকরো মিষ্টি আনতে পারে না ইত্যাদি নানা ভাষায় শাশুড়ি তাকে তিরস্কার করতেন। শেষে না পেরে ইমাম সাহেব স্বপনের কাছে দাবি জানালেন আপনিই মাজু মিয়াকে মিষ্টি আনার খরচ দেবেন। স্বপন প্রথমে আপত্তি করে বলে,

— কিন্তু বাবা-মাকে না জানিয়ে টাকা-পয়সা খরচ করা কি ঠিক হবে? আপনিই তো বলেছেন, বউয়ের কথা শুনে ছোট বড় কোন ব্যাপারেই বাবা-মায়ের কথার অবাধ্য হওয়া ঈমানদারের কাজ নয়।

ইমাম সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন,

— আপনার টাকা আপনি খরচ করবেন। এখানে বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়ার কি আছে? স্বপন বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বলে,

— আমার বাবা-মায়ের কড়া নির্দেশ, আমি যা কিছু ইনকাম করি তার সবই তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তারপর তারা ইচ্ছা মতো যেভাবে খুশি খরচ করবে। আমি তো চিরকাল তাই করে আসছি। এখন বলুন, এটা না করে পুরা টাকা বা কিছু টাকা নিজের কাছে রেখে দেওয়া বা অন্য কোন কাজে খরচ করা কি আমার জন্য ঠিক হবে?

ইমাম সাহেব যেন মহা ফাপড়ে পড়লেন। এব্যাপারে কোন একটা দলিল-প্রমাণ মনে করার আশ্রয় চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তার একটা হাদীস মনে পড়ে গেল। তড়িঘড়ি করে তিনি বললেন,

— ছেলের নিজের সম্পদের উপর কর্তৃত্ব তারই। কোথায় কতটুকু খরচ করবে বা কাকে কতটুকু দান করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপূর্ণ অধিকার তার আছে। এ ব্যাপারে তার বাবা-মা তাকে বাধ্য করতে পারে না। স্বপন চোখ নাচিয়ে বলে,

— দলিল কি?

এই প্রশ্নে ইমাম সাহেব মোটেও বিচলিত হলেন না। দলিল তার আগেই ভাবা রয়েছে। তিনি বলতে থাকেন,

— সহিহ বুখারীর একটি হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী এক লোকের হাতে কিছু টাকা দেন গরীব মানুষকে দান করার জন্য। ঘটনাক্রমে সেই লোক ঐ সাহাবার ছেলেকেই

টাকাটা দান করে দেয়। পরে ঐ সাহাবী জানতে পেরে তার ছেলেকে বলে, আমি তো তোমাকে দান করতে চায় নি। কিন্তু ঐ ছেলেটি টাকাটা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। এমনকি শেষে তারা রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বিচার নিয়ে যায়। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন ঐ সাহাবীকে বলেন, তুমি দানের সওয়াব পাবে। আর তার ছেলেকে বলেন, টাকাটা তোমার। এই হাদীস প্রমাণ করে, যদি ছেলে কোনো টাকার মালিক হয় আর বাবা তা দখল করতে চায় তবে ছেলে তাকে তা প্রদান করতে বাধ্য নয়। এক্ষেত্রে বাবা অতিরিক্ত চাপাচাপি করলে ছেলে এমনকি আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। টাকাটা যদি সে বাবার কাছ থেকেই পেয়ে থাকে তাতেই এ বিধান। আর যদি তা তার নিজের ইনকাম হয় তবে অবস্থা কেমন হবে?

দলীল শুনে স্বপন ভীষন খুশি হলো। এর মাধ্যমে তার নিকট অনেক বিষয় স্পষ্ট হলো। ইমাম সাহেব বলতে থাকেন,

— বিশেষত, বাবা-মা যদি সন্তানের সম্পদ জবরদখল করে তার স্ত্রী সন্তানদের উপর জুলুম করতে চায়, তবে সে জুলুম মেনে নেওয়া সন্তানের জন্য কখনই বৈধ নয়। যেহেতু স্ত্রী সন্তানদের উপর খরচ করা তার দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন না করলে তার পাপের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা তোমার উপর নির্ভরশীল তাদের উপর আগে খরচ করো। এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন আপনার বাবার পৃথক ইনকাম রয়েছে। তিনি আপনার মা ও ভাই-বোনদের খরচ বহন করতে বাধ্য। তাই আপনার বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি কেউই আপনার ইনকামের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আপনার স্ত্রী ও সন্তানের উপর খরচ করার মত আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। অর্থাৎ তারা আপনার উপর নির্ভরশীল। অতএব রসুলের কথা অনুযায়ী তাদের উপর আপনার আগে খরচ করা উচিত। অন্য হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ যখন বললেন, যারা তোমার উপর নির্ভরশীল তাদের উপর আগে ব্যয় কর। তখন সাহাবারা বললেন, তারা কারা? রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, তোমার স্ত্রী তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সে বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও, না হয় তালাক দিয়ে দাও। তোমার সন্তানরাও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তারা বলবে, আমাদের খাবার দিন, আমাদের আপনি কোথায় ফেলে দেবেন?

একটু জিড়িয়ে নিয়ে ইমাম সাহেব আবার বললেন,

— আপনার বাবা-মা যদি পৃথক ইনকাম না থাকার কারণে আপনার উপর নির্ভরশীল হয় তবে তারাও এর মধ্যে পড়বে। কিন্তু তখনও তাদের সাথে সাথে স্ত্রী-সন্তানদের বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে। সবার অধিকার আদায় করতে হবে। সকল সম্পদ বাবা-মার হাতে তুলে দিয়ে স্ত্রীকে কষ্টে রাখা উচিত হবে না। আর যদি আপনার বাবা-মা আপনার উপর নির্ভরশীল না হয় তবে তো স্ত্রী-সন্তানদের উপরে খরচ করার বিষয়টি তাদের চেয়ে প্রাধান্য পাবে। যেহেতু, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নির্ভরশীলদের উপর আগে খরচ করো। নাসায়ী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমার নিকট একটি দিনার আছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার নিজের উপর খরচ করো। ঐ ব্যক্তি আবার বলল, আমার নিকট আরও একটি দিনার আছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার স্ত্রীর উপর খরচ করো। সে বলল, আমার নিকট আরও একটি দিনার রয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা তোমার সন্তানদের উপর খরচ কর। এখানে দেখা যাচ্ছে, নিজের পরই নিজের স্ত্রী সন্তানদের উপর খরচ করতে হবে। অতএব, পিতা-মাতার হাতে সমস্ত সম্পদ ছেড়ে দিয়ে নিজ স্ত্রী সন্তানকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া সঠিক নয়। তারা যদি স্ত্রী সন্তানের উপর জুলম করে তবে তার দায়ভার স্বামীর উপরেই পড়বে।

ইমাম সাহেবের মুখে এসব দলীল প্রমাণ শুনে স্বপন ভীষন খুশি হয়ে যায়। প্রতিটি কথায় সে খাতায় লিখে নেয়। সেই থেকে মাজু মিয়াকে কিছু খরচও দেয়। যাতে করে মিয়া বাড়িতে আসার সময় কিছু মিষ্টি সামগ্রী নিয়ে আসে। তাতে ইমাম সাহেবের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। তাছাড়া নিজেও মাঝে মাঝে ইমাম সাহেবের জন্য বাদাম, মিঠাই কিনে আনে। আর ভাবে যদি এসব কথা আগে জানতাম তাহলে সংসার আলাদা করতে না পারলেও কমপক্ষে সুমিকে গোপনে কিছু কিনে দিতাম। তাতেও হয়তো সে জানতো যে, স্বপন তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসে। তাহলেও হয়তো তার মনটা কিছুটা শান্তি পেতো।

মাজু মিয়ার হাত থেকে মিষ্টি সামগ্রী গুলো নিতে নিতে স্বপনের মা হাক পাড়লেন।

— কই গো বউমা, দেখো কে এসেছে। তাড়াতাড়ি রান্নাবাড়া করো। খাদ্য-খাবার দাও। শাশুড়ির কণ্ঠ শুনে ইমাম সাহেব যেনো চমকে উঠলেন। মনে হচ্ছে তার মৃত মা কবর থেকে উঠে এসেছেন।

তার মনের মধ্যে বড় একটা খটকা লাগে।

— এত মমতার হেতুটা কি? মিষ্টি সামগ্রী তো মাজু মিয়া এর আগেও এনেছেন। কিন্তু এমন মমতামাখা কণ্ঠ তো শুনা যায় নি কখনও।

রহস্য উদ্ঘাটন হতে খুব বেশি সময় লাগল না। খেতে খেতে শাশুড়ি প্রসঙ্গটা তুললেন।

— বুঝলেন বেয়ায় সাহেব, ভাবছি ঐ দক্ষিণ পাশে দুটো পাকা ঘর তুলব।

মাজু মিয়া নাদান লোক। সারাটা জীবন অভিনয় করে কাটিয়েছেন। বাস্তব জীবন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতায় তার নেই। একটা মাত্র মেয়ে ছিলো। সেও ছোট বেলায় হারিয়ে গেছে। তাকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠাতে হয় নি। শ্বশুর বাড়ির ঠেলাও তাকে তাই সামলাতে হয় নি। একারনেই এই দু কামরা ঘরের মধ্যে যে কি দুঃসংবাদ লুকিয়ে আছে তা তিনি বুঝতে পারেন না। খুব স্বাভাবিক ভাবে বলেন,

— এতো সুসংবাদ। ঘর তুলবেন সেতো ভালো কথা।

স্বপনের মা একটু ভনিতা করে বলেন,

— কথা তো ভাই ভালোই। কিন্তু টাকা কোথায়?

প্রশ্ন শুনে মাজু মিয়া যেনো খুব মজা পেলেন। মিয়া বাড়ির টাকা কোথায় লুকানো আছে সেটা তিনি কি করে জানবেন। একটু হেসে উঠে তিনি বললেন,

— কোথায় আবার হবে। ব্যাংকে, বিয়ায় সাহেবের একাউন্টে।

কথাটা শুনে স্বপনের মা বিব্রত হন। তিনি একটা সিরিয়াস বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন।

তার মধ্যে মস্করা করা তার একেবারে পছন্দ নয়। মুখটা কালো করে তিনি বললেন,

— দু কামরা ঘরের ছাদ কিন্তু আপনাকেই করে দিতে হবে।

মাজু মিয়া এবার আরও বেশি মজা পেলেন। হো হো করে হেসে বললেন,

— বিয়ান সাহেব কি পাগল হলেন নাকি? আমি কি রাজমিস্ত্রি যে ঘরের ছাদ করে দেব। আমি হলাম যাত্রাপালার লোক। ছাদ হয়ে যাওয়ার পর তার উপর গিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে পারবো। কিন্তু ছাদ না হওয়া পর্যন্ত তো কিছুই করতে পারবো না।

স্বপনের মা এবার ভীষন রেগে গেলেন। মাজু মিয়ার বদলে তিনি নিজেই ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করলেন। চোখ মুখ ভীষন ভাবে ভাঙিয়ে বলতে লাগলেন,

— ছাদ করে দিতে না পারলেও ছাদ করার খরচ তো দিতে পারবেন, নাকি একে বারে ফকিরের বাচ্চা আপনি?

কথাটা শুনে মাজু মিয়ার হাস্যজ্বল মুখটা পুরা শুকিয়ে গেলো। এতক্ষণে তিনি ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন। আমতা আমতা করে বললেন,

— আমি টাকা দেব?

তার বিয়ান সাহেব বললেন,

— আহা নেকা আমার, তবে কে দেবে শুনি। সে ঘরে কি আমি থাকবো? না আমার চৌদ্দ গোষ্ঠী থাকবে। আপনার মেয়েই তো সেখানে ইয়ে নিয়ে শুয়ে থাকবে।

এরপর তিনি আরও কিছু বিশী ভাষা বললেন। মাজু মিয়া খাওয়া বন্ধ করে মানুষও নয় গরুও নয় এমন একটা ভাব করে বসে থাকলেন। কোন ফাঁকে মিয়া বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়া যায় তিনি মনে মনে সেই সুযোগ খুঁজছিলেন। স্বপন আর তার বাবাও সেখানে উপস্থিত ছিলো। ইমাম সাহেবও ছিলেন। তারা কেউই কোনো কথা বলতে পারলো না। কাল বৈশাখী ঝড়ের সামনে নত হয়ে যাওয়া কাটা গাছের মতই মাথা নিচু করে বসে ছিলো তারা সবাই। স্বপনের মা তখনও এক চেটিয়া ঝাপান গেয়ে চলেছেন। মাজু মিয়াকে তিনি এমন সব ভাষায় গালি দিচ্ছেন যা তিনি জীবনে শোনেননি। সত্যি বলতে কি বাংলা ভাষায় এমন গালিও যে আছে ছোটখাটো একটা সাহিত্যিক হয়েও তিনি তা জানতেন না। তিনিও মাথাটা নিচু করে আছেন। দুটি চোখ বেয়ে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ইমাম সাহেবও কাদছেন। মাজু মিয়া তার বাবা নন। তবে এই নাটকে তিনি বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এ অভিনয় যে এত নিষ্ঠুর হবে তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারলে কখনও এতে পাঠ নিতেন না। ইমাম সাহেবও বিষয়টা জানতেন না। কেবল স্বপন জানতো। হাড়ে হাড়ে জানতো। জানতো বলেই সে তাদের এই অভিনয়ে পাঠ নিতে বাধ্য করেছে। যাতে তারা বুঝতে পারে বাস্তব জীবন কত কঠিন। স্বপনের মা ক্লান্ত হয়ে একটু দম নিতেই মাজু মিয়া উঠে দাড়িয়ে কারও দিকে না তাকিয়েই বললেন,

— আমি চলে যাচ্ছি।

কথাটা বলে মাথা নিচু করেই তিনি হনহন করে হাটতে থাকেন। স্বপনের মা সাথে সাথে ভিতরে গিয়ে দই মিষ্টির হাড়িগুলো নিয়ে এসে তার পিছনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন,

— এগুলোও সাথে নিয়ে যা ফকিরের বাচ্চা।

মাজু মিয়া পিছনের দিক থেকে ধপাস করে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনলেন। কিন্তু ঘুরেও সে দিকে তাকালেন না। দ্রুত পা চালিয়ে বের হয়ে গেলেন। সেদিন থেকেই ইমাম সাহেবের উপর গুরু হলো অসহ্য ও অবর্ণনীয় নির্যাতন। কোনো মানুষ কোনো মানুষকে গায়ে হাত না দিয়েই এত সাজা দিতে পারে ইমাম সাহেব তা স্বপ্নেও ভাবেনি। তিনি ছোট থেকেই মাদ্রাসায় পড়েছেন। মাদ্রাসার শিক্ষকদের ছোট ছোট কচি বাচ্চাদের পিঠে বড় বড় বেত ভাঙতেও তিনি দেখেছেন। তখন ভাবতেন, নির্যাতন নিপিড়নের এই বুঝি শেষ সীমা। কিন্তু এখন তার ভুল ভেঙেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, শাশুড়িরা বেটোর বউদের উপর যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তা ঐ শারীরিক কষ্টের চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রনাদায়ক। শেষে একদিন ইমাম সাহেব বাধ্য হয়ে স্বপনকে বললেন,

— এর চেয়ে আপনি বরং আমাকে গলায় ফাস দিয়ে মেরে ফেলেন।

স্বপন দ্রু নাচিয়ে বলল,

— ইমাম সাহেব, আপনি কিন্তু আত্মহত্যা করতে চাচ্ছেন। যা কিনা ভীষণ অন্যায়। ইমাম সাহেব বললেন,

— এ নিপিড়ন থেকে বাচার আর তো কোনো রাস্তা দেখছি না।

একটু হেসে পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করে স্বপন বলল,

— এভাবে সবাই হার মেনে নিয়ে পালিয়ে গেলে হবে? শাশুড়িদের মোকাবেলা করতে হবে না?

ইমাম সাহেব হতাশাভরা কণ্ঠে বলেন,

— আমি পারবো না। অত গালাগাল কি আমার মুখস্ত আছে?

স্বপন হালকা ধমক দিয়ে বলে,

— আরে মিয়া আপনি গালাগাল দেবেন কেনো? আপনি বলবেন কোরআন-হাদীস। শাশুড়িদের এই জুলুম নির্যাতনকে কুরআন-হাদীসের আলোকে বাতিল প্রমাণ করলেই তো তারা পরাজিত হবে। এমন জুলুম নির্যাতন করলে সংসার যে আলাদা করা যায় সেটা প্রমাণ করতে পারলেই তো বেটার বউরা এ থেকে উদ্ধার পাবে। সেটাই তো হবে তাদের বিজয়। আর আপনি যেহেতু বেটার বউ এর ভূমিকাই অভিনয় করছেন তাই একজন বিবিজান হুজুর হিসেবে তাদের বিজয়ই তো আপনার বিজয়।

জয় পরাজয়ের প্রশ্ন আসতেই ইমাম সাহেবের মনে জিদ উঠে গেলো। নাটকের শুরু যখন হয়েছেই তখন তার শেষটা তিনি সফল ভাবেই সম্পন্ন করবেন। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন,

— ঠিক আছে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। তবে এ জন্য আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আমাকে কিছু কিতাব পত্র এনে দিতে হবে।

বলে স্বপনকে তিনি এক জনের ঠিকানা দিলেন। একটি চিঠিও লিখে দিলেন যাতে তার হাতে চিঠিতে লেখা কিতাব গুলো প্রদান করে। পরের দিনই স্বপন ব্যাগ ভর্তি করে বই পত্র এনে দিল ইমাম সাহেবকে। স্বপন ব্যাগ ভর্তি করে কি আনছে দেখে স্বপনের মা প্রথমে আড় চোখে তাকিয়ে দেখে নিলেন কি ব্যাপার। তারপর স্বপন ঘরে ঢুকতেই তিনি দৌড়ে এসে ঘরের মধ্যে উকুবুকি মারতে লাগলেন। যখন দেখলেন ব্যাগে কেবলই বই তখন হতবাক হয়ে বললেন,

— এত বই কি হবে?

স্বপন বলল,

— এগুলো সব কুরআন-হাদীস। একজন মসজিদে দান করেছে। আমাকে কিনতে পাঠিয়েছিলো। এখন তো মসজিদে ইমাম সাহেব নেই। ইমাম সাহেব আসলে তার হাতে দিয়ে দেব। ততদিন আমাদের বাড়িতে থাকবে।

কথা শুনে স্বপনের মা ঠোট উল্টে বিরক্তি প্রকাশ করে চলে গেলেন। সে দিন থেকে ইমাম সাহেব দিন রাত খাটুনি করেন। দিনের বেলা সংসারের কাজ করেন। আর রাতের

বেলা দলীল প্রমাণ ঘেটে সংসার আলাদা করার চেষ্টা করেন। এভাবে কয়েকদিন চলার পর একদিন ইমাম সাহেবের মুখে হাসি ফুটল। তিনি উপযুক্ত দলীল প্রমাণ পেয়ে গেছেন। এখন সে গুলো স্বপনকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারলেই তার মুক্তি।

পাঁচ.

রাতে স্বপন ফিরলে ইমাম সাহেব তাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রথমে বলেন,

— স্বামীর উপর স্ত্রীর যাবতীয় খরচ-খরচা বহন করা আবশ্যিক এটা তো আপনি জানেন।

স্বপন সম্মতি জানায়। সে জানে। ইমাম সাহেব বলতে থাকেন,

— কুরআন-হাদীস অনুযায়ী এ খরচ হবে তিনটি ব্যাপারে। এক. খাবার দাবার, দুই. পোশাক আশাক, তিন. বাসস্থান। হাদীস অনুযায়ী স্ত্রীকে এই তিনটি জিনিসের ব্যবস্থা করে দিতে স্বামী বাধ্য। বাসস্থানের বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ সুরা তালাকের ছয় নম্বর আয়াতে স্বামীর উপর স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক করেছেন।

ইমাম সাহেব কি বলতে চাচ্ছেন স্বপন যেনো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে হালকা বিস্ময় প্রকাশ করে বলে,

— কিন্তু বাসস্থানের ব্যবস্থা তো সবাই করে, আমিও করেছি। অতএব এ নিয়ে এত আলোচনার কি আছে।

ইমাম সাহেব মুচকি হেসে বলেন,

— আলোচনার অনেক কিছুই আছে। বাসস্থান হলেই তো আর হবে না। উপযুক্ত ও মানসম্মত বাসস্থান হতে হবে। না হলে দায়িত্ব মুক্তি হবে না।

স্বপন অবাক হয়ে বলে,

— কেন?

ইমাম সাহেব বলতে থাকেন,

— দেখুন, আপনার উপর আপনার স্ত্রীর খাবার-দাবারের ভার দেওয়া হয়েছে। এখন আপনি তার জন্য এমন একটা খাবার প্রতিদিন জোগাড় করে আনেন যা খেয়ে বেঁচে থাকা যায় কিন্তু তা বেজায় তেতো ও বিষাদ ফলে তা খাওয়া খুবই কষ্টকর। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে খাবার দাবার দেওয়ার যে দায়িত্ব আপনার উপর ছিল তা কি আদায় হবে?

স্বপন ডানে বামে মাথা নাড়িয়ে বলে,

— না না। এটা তো দায় মুক্তির কাজ নয়, বরং দায়সারা কাজ।

ইমাম সাহেব হেসে বলেন,

— তাহলে দায় মুক্তি হবে কেমন খাবারে?

স্বপন বলে,

— সুস্বাদু ও রুচিসম্মত খাবার দিতে হবে। যা মানসম্মত ও খাওয়ার উপযুক্ত হবে।

ইমাম সাহেব ভীষন খুশি হয়ে বলেন,

— এবার ধরুন, এক স্বামী তার স্ত্রীকে এমন পোষাক বানিয়ে দেয় যা পরিধান করলে সতর ঢাকা হয় ঠিকই কিন্তু সারাটা শরীর চুলকায় আর ভীষন কষ্ট হয়। এই স্ত্রীকে পোষাক দেওয়ার যে দায়িত্ব এই স্বামীর উপর ছিলো তা কি আদায় হবে?

স্বপন আবার মাথা নাড়ে,

— উহু। তা কি করে হয়। যে পোশাক পরে সারা শরীর চুলকিয়ে খেয়ে নিচ্ছে তাকে কি পোশাক বলা যায়।

ইমাম সাহেব এবার হালকা ধমকের স্বরে বলেন,

— তাহলে যে বাসস্থানে বাস করে স্ত্রীকে সারাটা দিন শাশুড়ির গালাগাল শুনতে হয় আর নানা রকমের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও জুলুম নির্যাতনের স্বীকার হতে হয় সেই বাসস্থানকে কি বাসস্থান বলা যাবে? আর এর মাধ্যমে কি দায় মুক্তি হবে?

স্বপন এতক্ষণে ইমাম সাহেবের বক্তব্য অনুধাবন করতে পারে। তার মুখটা হাস্যজ্বল হয়ে ওঠে। নিজের অজান্তেই সে বলে ওঠে,

— অত্যন্ত চমৎকার যুক্তি।

তারপর তড়িঘড়ি করে খাতা বের করে সে কথা গুলো লিখে ফেলে। ইমাম সাহেব অবশ্য এখনও কথা শেষ করেননি। তিনি বলতে থাকেন,

— এই কারণেই চার মাঘহাবের সকল আলেম ওলামা বলেছেন, দুই সতীনকে স্বামী তাদের সম্মতি ছাড়া একই বাড়িতে একসাথে রাখতে পারবে না। আলাদা আলাদা রাখতে হবে।

স্বপন কৌতুহলী হয়ে বলল,

— কেনো?

ইমাম সাহেব বললেন,

— কারণ দুই সতীন এক বাড়িতে থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সারাক্ষণ ঠোকামুকি ও ঝগড়া-ঝাটি হয়। অতএব যে স্বামী দুই সতীনকে একত্রে রাখে সে নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে বলে গন্য হয় না। তাই তার দায়মুক্তিও হয় না।

স্বপন এবার বিষয়টা বুঝতে পারে। ইমাম সাহেব বলতে থাকে,

— স্বামীর মা-বাবা বা অন্য কোনো আত্মীয়ের সাথেও একই বাসস্থানে স্ত্রী থাকতে বাধ্য নয়। যদি সে পৃথক বাসস্থানে থাকতে চায় তবে তার জন্য সে ব্যবস্থা করে দিতে স্বামী বাধ্য। বিভিন্ন মাঘহাবের ফিকাহ গ্রন্থে বিশেষত আমাদের হানাফী মাঘহাবে এ কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে ঐ একই কথা বলা হয়েছে যে, একত্রে এক বাসস্থানে থাকলে স্বামীর মা-বোনেরা স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমনটা আমরা বর্তমান সমাজে ঘটতে দেখি।

স্বপন অবাক হয়ে বলে,

— তার মানে স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে এক সাথে থাকতে না চাইলে সংসার আলাদা করা যায়?

ইমাম সাহেব একটু জোর গলায় বলেন,

— করা যায় নয়। করে ফেলতে হয়। এটা স্বামীর দায়িত্ব। না করলে স্ত্রীর হক নষ্ট হয়,

তাতে পাপ হয়। এই যে দেখুন, এইসব ফিকার কিতাবে তাই লেখা রয়েছে।

রাগে দাত কিড়মিড় করতে করতে স্বপন বলে,

— এই কথাটা এতদিন কোথায় ছিলো?

ইমাম সাহেব ভীতসঙ্কুত হয়ে বলেন,

— মনে ছিলো না।

ইমাম সাহেবের ভয়াত মুখ দেখে স্বপনের মায়া হয়। সে জানে আসলেই তার মনে ছিলো না। তবে কথায় বলে, যার পেটে বিদ্যা আছে পেটে লাথি মারলে কমপক্ষে তার মুখ দিয়ে ব বের হয়। ইমাম সাহেবের মুখ দিয়ে সেই ব বের করার জন্য এত আয়োজন করে সে এই নাটক সাজিয়েছে। তার সেই ফন্দি এখন কাজ করছে। অতএব তাতে রাগান্বিত না হয়ে তার তো খুশিই হওয়া উচিত। স্বপন তাই এবার মেজাজ ঠান্ডা করে খুশি হওয়ার চেষ্টা করলো। তার মনের মধ্যে এখনও কিছু প্রশ্ন উকিঝুকি দিচ্ছে। কিছুক্ষন ভেবে নিয়ে সে বলল,

— তাহলে আমার মা-বাবার কি হবে? তাদের কি বিদ্বাশ্রমে রেখে আসতে হবে নাকি ঝুড়িতে করে নিয়ে গিয়ে মাঠে ফেলে দিয়ে আসতে হবে?

ইমাম সাহেব হালকা হেসে বললেন,

— না না। তা কেনো করবেন? বাবা-মায়ের দায়িত্বও তো আপনারই উপর। তাদের ব্যাপারে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপনার দায়িত্ব। এর সাথে আপনার স্ত্রীর কোনো সম্পর্ক নেই। যদি তারা অভাবী হয় তবে আপনি তাদের বাজার করে দেবেন। আর যদি রান্নাবাড়া করতে অক্ষম হয় তবে রান্নাবাড়ার জন্য আপনি লোক নিয়োগ করবেন। স্ত্রী এমন কে যে সে দায়িত্ব না নিলে আপনার বাবা-মাকে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। যতদিন বিয়ে করেননি ততদিন কি বাবা-মা ঘরে ছিলো না।

স্বপন বিষয়টা বুঝতে পারে। তবুও আরও একটু খোলসা হওয়ার জন্য বলে,

— স্ত্রীকে দিয়ে বাব-মার কোনো কাজ কি কখনই করানো যাবে না?

ইমাম সাহেব তাকে আশ্বস্ত করে বলেন,

— যদি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে স্বেচ্ছায় কিছু করানো যায় তাহলে তা করতে পারেন। তবে তাকে বাধ্য করার কোনো অধিকার আপনার নেই। নিয়ম অনুযায়ী আপনার স্ত্রী কেবল আপনার খেদমত করতে বাধ্য। আপনার বাবা-মা বা ভাই-বোনদের নয়।

স্বপন চিন্তিত মুখে বলল,

— কিন্তু এ কথা শুনলে তো বেটার বউরা সাহস পেয়ে যাবে। তখন বুঝিয়ে শুনিয়ে কি তাদের দ্বারা শ্বশুর শাশুড়ির কোনো কাজ করানো যাবে?

ইমাম সাহেব ডানে বায়ে মাথা নাড়েন।

— আপনি ভুল বুঝছেন। বর্তমান সমাজটাকে দেখুন। শাশুড়িদের পক্ষে এক তরফা ফতোয়া চলছে। এর পরিণাম কি হচ্ছে। বুড়ো বয়সে বেটার বউ দের হাতে পড়ে শাশুড়িদের কি হাল হচ্ছে তা তো নিজ চোখেই দেখছেন। শাশুড়িদের পক্ষে এক তরফা ফতোয়া কি শাশুড়িদের এমন দশা থেকে বাচাতে পারছে?

স্বপন অবাক হয়ে মাথা ঝাকাতে থাকে,

— তাই তো! কিন্তু এর কারণ কি?

ইমাম সাহেব বলতে থাকেন,

— দেখুন শাশুড়ি পক্ষের মোল্লারা শাশুড়িদের প্রতি বেটার বউদের অবিচার বন্ধ করতে চাচ্ছে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে তারা একটা ভুল পন্থা অবলম্বন করেছে। তারা এক তরফা ভাবে শাশুড়ি পক্ষের ওয়াজ করে যাচ্ছে। ফলে শাশুড়িরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সুযোগ পেলেই বেটার বউদের উপর অন্যায় অবিচার করছে। তাদের কোনো অধিকার আদায় করছে না। এর ফলে পরবর্তীতে বুড়ো বয়সে এই সব শাশুড়িরা যখন বেটার বউদের হাতে পড়ছে তখন তারা তাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। এ ভাবে যুগের পর যুগ ধরে চলছে পারিবারিক সংঘাত। এর জন্য অবশ্য শাশুড়িরাই বেশি দায়ী। যেহেতু শুরুটা তারাই করছে। এমন কোনো বেটার বউ নেই যে বিয়ের পর কিছুদিন শাশুড়ির অধীনে কাটায় না। বিয়ের পরপরই তো আর গিল্লি হয়ে বসা যায় না। এক দিনে সংসার আলাদাও করা যায় না। কিছু দিন শাশুড়ির অধীনে থাকতে হয়। ঐ সময় শাশুড়ি বেটার বউ এর অধিকার সম্পর্কে জেনে সঠিক ভাবে তা আদায় করলে বেটার বউও হয়তো

পরবর্তীতে শাশুড়িকে খেদমত করতো। কিন্তু শাশুড়িরা সুযোগ পেয়ে তাদের উপর চালায় নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার। এতে করে বেটার বউদের মন মেজাজ যায় বিগড়ে। পরবর্তীতে বেটার বউ এক সময় সংসারের গিল্মি হয়ে ওঠে। তখন সে শাশুড়ির পাতে এক মুঠো ভাতও দিতে চায় না। অথচ এ বেটার বউই নিজে হাতে অনেক ফকির মিসকিনকে খেতে দেয়। তবুও শাশুড়িকে খেতে দিতে চায় না। সমাজের লোক শুধু এই বিষয়টিই দেখে। কিন্তু এর গোড়া কোথায় সেটা ভেবে দেখে না। গোড়ায় ওষুধ দিতেও চায় না।

স্বপন ইমাম সাহেবের কথা পুরোপুরি বুঝতে পারে। বউ- শাশুড়ির দ্বন্দের গোড়া কোথায় তাও সে অনুধাবন করে। কিন্তু গোড়ায় ওষুধ দেওয়ার বিষয়টি তার বুঝে আসে না। অবাক হয়ে তাই সে বলে,

— গোড়ায় ওষুধ দেওয়ার মানে কি?

ইমাম সাহেব বলেন,

— আগেই আপনাকে একটা হাদীস বলে নিই। সহীহ মুসলিমে এসেছে, এক সাহাবী তার একটি ছেলেকে কিছু বেশি সম্পদ দেওয়ার ইচ্ছা করলে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, যদি তুমি চাও তোমার ছেলেরা সবাই তোমার সমান ভাবে দেখাশোনা করুক তবে এটা করো না। এই হাদীস থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। অনেক সময় দেখা যায় বাবা-মা কোনো একটি ছেলেকে ফাঁকি দেয়। ফলে ঐ ছেলে বুড়ো বয়সে বাবা-মাকে দেখাশোনা করে না। সমাজের লোক তখন কেবল ছেলেটাকেই দোষ দেয়। বাবার অপকর্ম সম্পর্কে কেউই কিছু বলে না। রসুলুল্লাহ ﷺ এখানে গোড়ায় ওষুধ দিয়েছেন। তিনি বাবা-মার ভালো চেয়েছেন বলেই এমন কিছু করতে নিষেধ করেছেন। যার কারণে সন্তান মেজাজ বিগড়ে যায়। তিনি বাবা-মাকে ছেলেদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করে তা নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যাতে পরবর্তীতে ছেলেরা রাগান্বিত হয়ে বাবা-মায়ের অধিকার নষ্ট না করে। যারা শ্বশুর-শাশুড়ির ভালো চান তাদের একই পন্থা অবলম্বন করা উচিত। একতরফা ভাবে শাশুড়ি পক্ষের ওয়াজ না করে শ্বশুর-শাশুড়িকে বেটার বউয়ের অধিকার সম্পর্কেও অবহিত করতে হবে এবং তা সুষ্ঠুভাবে পালন করার নির্দেশ দিতে হবে। যাতে বেটার বউদের অন্তরে শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি না হয়। এই ইনসানের মাধ্যমেই পারিবারিক সংঘাত বন্ধ করা সম্ভব হবে। বন্ধ হবে

যুগ যুগ ধরে চলে আসা বউ শাশুড়ির লড়াই। এক তরফা ওয়াজ একে যেমন আগেও বন্ধ করতে পারে নি পরেও পারবে না।

একটু দম নিয়ে ইমাম সাহেব আবার বলেন,

— বেটার বউদের অধিকার সম্পর্কে জানলে আরও একটা উপকার হবে। যখন শ্বশুর-শাশুড়ি জানবে আইনত বেটার বউ তাদের খেদমত করতে বাধ্য নয় তখন তারা যতটুকু খেদমত পায় তাতেই খুশি হবে। আর যদি তারা ভাবে বেটার বউ এর উচিত দাসী বান্দীর মত সেবা যত্ন করা তাহলে সামান্য ভুলচুক হলেই হইহটগোল বাধিয়ে দেবে শুরু হয়ে যাবে ঝগড়া বিবাদ। অতএব কারও অধিকারের কথা গোপন রেখে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। বরং সবার অধিকার জেনে ও মেনেই শান্তি আসতে পারে।

সব কিছু বুঝে নেওয়ার পর স্বপনের মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়। ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে,

— আর ঐ যে যুদ্ধে বন্দী হওয়া কাফের মহিলা ও তাদের সন্তানদের মাঝে আলাদা করা যাবে না। এটার কি হবে?

কথা শুনে ইমাম সাহেব লজ্জা পেয়ে বললেন,

— এটা একটা গোজা মিল। এখানে কি আর মায়ের সাথে ছেলেকে আলাদা করা হচ্ছে। এখানে আলাদা করা হচ্ছে শাশুড়ির সাথে বেটার বউয়ের। বউকে আলাদা বাড়িতে রেখে ছেলে সারাদিন মায়ের কাছে পড়ে থাক। রাত হলে বউয়ের কাছে ফিরে আসলেই হবে। তখন তো আর মায়ের সাথে এক ঘরে থাকতে পারছে না।

বলে তিনি হি হি করে হাসতে থাকেন। তার সাথে সাথে স্বপনও হেসে ওঠে। এই ছোট্ট ধাঁধাটাও সে এতদিনে সমাধান করতে পারেনি ভেবে বেশ অবাক হয়।

সেদিন সকালে স্বপনের মা তুলকালাম কাশ্ব বাধিয়ে দিলেন। রাতে আড়ি পেতে তিনি অনেক কথায় শুনেছেন। তার বেটার বউ ছেলেটাকে আলাদা হওয়ার ব্যাপারে কি সব বলছিলো। কেবল এতটুকু বুঝতে পেরেছেন। তাই মেয়েটাকে সাথে নিয়ে তিনি আজ বেটার বউ এর সাথে একটা হেস্তন্যস্থ করার জন্য পুরা প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছেন। প্রয়োজনে এমনকি বেটার বউ এর গায়ে হাত পর্যন্ত তুলবেন এমন একটা সিদ্ধান্তও

তিনি পাকাপাকিভাবে নিয়ে রেখেছেন। তার বউ ছেলে তখনও ঘুম থেকে উঠেনি। ফাঁকা মাঠেই মা-মেয়ে এত চিল্লা চিল্লি করছে এর মাঝে তারা যে কিভাবে ঘুমাচ্ছে এটাই প্রশ্ন। পাড়া প্রতিবেশিও বিনা টিকিটে যাত্রাপালা দেখার জন্য জমায়েত হয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের অনুপস্থিতিতে ঝগড়াটা জমে উঠছে না। পাড়ার একজন বৃদ্ধা মহিলা বিষয়টা খেয়াল করে স্বপনদের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলো।

— আরে ঐ নাত বউ, ওঠ।

কিন্তু কেউ উঠলো না। কারও কোন সাড়া শব্দও পাওয়া গেলো না। অধৈর্য হয়ে বুড়িটা শেষে দরজা ঠেলে ঘরেই ঢুকে পড়ল। কিন্তু একি! ঘর যে খা খা করছে, কেউ নেই। বুড়িটি বাইরে এসে চিৎকার করে খবর জানাতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। কেউ কেউ বলল,

— আগের বার কেবল বউ ভেগেছিলো। এবার দেখি বউ ছেলে দুইই ভেগেছে। কি উদ্ভট কান্ড রে বাবা।

স্বপনের মা হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতেই বার বার অভিশাপ দিয়ে বলতে লাগলেন,

ওরে পোড়া কপালী। কি যাদু শোনালি,

ছেলে নিয়ে পালালি, আমাকে যে ডোবালি।

পরিশিষ্ট

পরের দিনই স্বপন বাড়ি ফিরে আসে। কদিন পর ইমাম সাহেবও মসজিদে ফিরে আসেন। তার মুখে খোঁছা খোঁছা দাড়ি গজিয়েছে। সেক্রেটারী সাহেবকে তিনি বলেছেন, কি একটা রোগে তার সব দাড়ি গোঁফ পড়ে গিয়েছিলো। রোগটার নাম কি তা তার মনে নেই। ঐ রোগে তার স্মৃতি শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। কথা শুনে সেক্রেটারি সাহেব প্রথমে একটু অবাক হলেন। হয়তো তিনি ভাবছিলেন, কি এমন রোগ যাতে দাড়ি গোঁফ পড়ে যায় কিন্তু মাথার চুল ঠিক থাকে? তার মনে হলো, ইমাম সাহেবকে এ বিষয়ে

একটা প্রশ্ন করবেন। পরে ভাবলেন, সে যা একটা গাধা লোক এ প্রশ্নের কোনো উত্তরই দিতে পারবে না। তাই তিনি প্রশ্ন ছেড়ে দুঃখ করে বললেন,

— আহা বেচারি, রোগে শোকে পড়ে শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। দরকার হলে তুমি আরও কটা দিন ছুটি নাও। আমি তোমাকে খুব স্নেহ করি। তুমি আমার বেটার বউ এর মত।

কথা শুনে পাশের দু একজন লোক হেসে উঠল।

— এমন কথা কেউ বলে। মানুষ বলে তুমি আমার ছেলের মত কি ভাইয়ের মত।

সেক্রেটারি সাহেব নিজেই বুঝতে পারেন কথাটা ভুল হয়েছে। তিনি লজ্জিত হয়ে বলেন,

— কিছু মনে করো না। আসলে তোমার চেহারাটা কেন জানি আমার দুই নাম্বার বেটার বউ এর মত লাগছে।

কথা শুনে ইমাম সাহেব গোপন কথা ফাস হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তড়িঘড়ি করে বলেন,

— দাড়ি গোঁফ গজালে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেক্রেটারি সাহেবও মাথা ঝাকিয়ে তার কথার সম্মতি জানান। তারপর বলেন,

— কি ছুটি লাগবে?

ইমাম সাহেব উত্তরে বলেন,

— না না। আমার আর ছুটির দরকার নেই।

কথা শুনে সেক্রেটারি সাহেব খুব খুশি হলেন। ছুটির কথা তিনি মুখ ফসকে বলেছেন বটে। কিন্তু ইমাম-মুয়াজ্জিনকে ছুটি দেওয়া তার একেবারে পছন্দ নয়। খুশি হয়ে তিনি বললেন,

— ঠিক আছে। তাহলে তোমার বেতন পঞ্চগশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম।

কথা শুনে ইমাম সাহেবও বেজায় খুশি হলেন। আবার শুরু হলো খুশি আর পাল্টা খুশির পালা। ইমাম সাহেব যথাসময়ে পাঁচ মিনিট আগেই মসজিদে আসতে লাগলেন আর

যথারীতি জুম্মার খুতবাও দিতে থাকলেন। তার ওয়াজের বিষয়বস্তুতে অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন এসেছিলো। অনেক চেষ্টা করেও শাশুড়িদের পক্ষে এক তরফা ওয়াজ তিনি আর করতে পারতেন না। কেবলই বেটার বউদের পক্ষে ওয়াজ করতে ইচ্ছা হতো। কিন্তু তাতে চাকরি যাওয়ার ভয়। তাই তিনি তা করতে পারতেন না। এ কারণে শাশুড়িদের পক্ষে ওয়াজও যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন।

মাজু মিয়া এর মধ্যে কয়েকবার মিয়া বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে এসেছেন। তার হারানো মেয়েটা আবার হারিয়ে গিয়েছে। এই দুঃখে তিনি বুক চাপড়ে কেঁদে এসেছেন। সেই সাথে মিয়া বাড়িতে একটা হুমকিও দিয়ে এসেছেন। বলেছেন,

— তোমার ছেলে আমার মেয়েকে খুন করেছে। তা না হলে এক সাথে এক রাত্রে ঘর থেকে বের হয়ে সে ফিরে আসলো আর আমার মেয়ে ফিরে আসলো না কেনো। পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ না দিলে আমি থানায় মামলা করবো। তোমাদের সবাইকে জেলের ঘানি টানিয়ে তবে শুনবো।

বাধ্য হয়ে সেক্রেটারি সাহেব দরদাম করে তাকে পঁয়ত্রিশে রাজি করিয়েছেন। টাকাটা নগদ তার হাতে প্রদান করেছেন তিনি। টাকাটা হাতে পেয়ে মাজু মিয়ার মনটা ভীষন খুশি হয়ে গেছে। জীবনে কোনো যাত্রাপালায় অভিনয় করে এত টাকা কামায় করেননি তিনি। এ টাকা অবশ্য সবই তার নয়। এটা তিনভাগে ভাগ হবে। নাটকে যারা অভিনয় করেছে তারা সবাই এতে অংশ পাবে। মাজু মিয়া ভেবেছিলেন সবাই সমান পাবে। কিন্তু স্বপন এসে বলল ভিন্ন কথা। সে বলল,

— আমিই যেহেতু নাটকের পরিচালক আবার নায়ক। তাই আমি পাব সবার চেয়ে বেশি। নায়িকা ওরফে ইমাম সাহেব পাবে তার চেয়ে একটু কম। আর আপনি পাবেন সবার চেয়ে কম।

মাজু মিয়া অভিনয়ের জগতের লোক। সে জগতের নিয়মকানুন তিনি ভালো মতই জানেন। এ বন্টন তাই তাকে মেনে নিতেই হলো। ঠিক হলো, স্বপন পাবে বিশ হাজার, ইমাম সাহেব দশ হাজার আর মাজু মিয়া পাবে পাঁচ হাজার। দশ হাজার টাকা পেয়ে ইমাম সাহেব ভীষন খুশি হলেন। ঠিক করলেন, এমন অভিনয়ের সুযোগ আবারও পেলে তিনি তা হাতছাড়া করবেন না।

এসব কাহিনী শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হলো সুমি। তার কপাল খুলে গেছে। একদিন স্বপন চুপিচুপি গিয়ে হাজির হয়েছে তাদের বাড়ি। প্রথমে সুমি তো গোন্ডা-খুনি ইত্যাদি নানা ভাষায় তিরস্কার করল। স্বপন অবাক হয়ে বলল,

— আমি জীবনে একটা মশা মাছি পর্যন্ত মারতে পারি না। আর তুমি আমাকে খুনি বলছ?

সুমি কেঁদে কেঁদে বলল,

— তবে তোমার দ্বিতীয় বউকে কে খুন করল?

কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল স্বপন। হাসতে হাসতেই বলল,

— কথাটা তাহলে এতদূর চলে এসেছে?

তারপর আসল ঘটনা খুলে বলতেই সুমির হাসি আর থামে না। হি হি করে হাসতে হাসতে বলল,

— বাবা, মা দেখে যাও কে এসেছে।

স্বপনকে দেখেই সুমির বাবা-মার রেগে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এই কটা মাস যে মেয়েটা নাওয়া খাওয়া ভুলে মন মরা হয়ে পড়েছিলো স্বপনকে কাছে পেয়ে তাকে অবলীলায় হাসতে দেখে তারা কিছুই বলতে পারলেন না। কেবল একবার তার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে থাকলেন। স্বপন আমতা আমতা করে বলল,

— আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে আম বাগানের কাছে আমাদের যে জমিটা আছে সেখানে আমি একটা ঘর তুলব। তারপর সুমিকে আবার বিয়ে করে আলাদাভাবে সংসার করব।

কথাটা শুনে সুমি হি হি করে হেসে উঠল। স্বপন ভাবল, সে বুঝি তার কথা বিশ্বাস করেনি। তাই সে পকেট থেকে বিশহাজার টাকার বান্ডিল বের করে তাকে দেখিয়ে বলল,

— টিন আর চাটাই এর একটা ঘর এতে হয়ে যাবে। তাতেই আমাদের দুজনের মাথা গোজার ঠায় হবে।

কথা শুনে সুমির দু চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। স্বপন বলল,

— সুমি, তুমি কি আমাকে আবার বিয়ে করতে রাজি আছো?

চোখের পানি মুছতে মুছতেই সুমি আবারও জোরে হেসে উঠল। তাকে কাদতে কাদতে এভাবে হাসতে দেখে স্বপন বেশ অবাক হলো। স্বামী সংসার ছেড়ে একা একা থেকে সুমি কি পাগল হয়ে গেছে? অবাক হয়ে সে বলল,

— হাসছো কেন? তুমি কি এখনও আমার কথা বিশ্বাস করছো না?

হাসতে হাসতেই সুমি মাথা নেড়ে বলল,

— আরে না। সেকারনে আমি হাসছি না। এ যে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছ একারনে হাসছি।

স্বপন অবাক হয়ে বলে,

— এর মধ্যে হাসির কি আছে?

সুমি আবারও একটু হেসে বলল,

— বিয়ে করার কি আছে! আমি তো তোমারই বউ। বউয়ের সাথে কি কেউ আবার বিয়ে করে? আমাকে বিয়ে করলে ঘরে ঘরে আত্মীয় হয়ে যাবে না?

স্বপন বোকা বোকা ভাব করে বলল,

— তুমি না আমাকে ডিভোর্স দিয়েছো?

সুমি হেসে বলে,

— তুমি কি তাতে স্বাক্ষর করেছো?

স্বপন মাথা নাড়ে। সে স্বাক্ষর করেনি।

সুমি বলে,

— তাহলে তুমি আমাকে তালাক দাও নি।

স্বপন এবার আরও জোরে মাথা নেড়ে বলে,

— প্রশ্নই আসে না।

শুনে সুমি বলে,

— তবে আবার কিসের বিয়ে?

স্বপন ভেবাচেকা খেয়ে বলে,

— কিন্তু তুমি তো আমাকে তালাক দিয়েছো?

সুমি হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের সাথে বলে,

— দূর বোকা। মেয়েরা কি তালাক দিতে পারে?

এতক্ষণে স্বপন বিষয়টা বুঝতে পারে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে,

— তাহলে তালাক হয় নি?

সুমি মুচকি হেসে বলে,

— না।

স্বপন বলে,

— সত্যি!

সুমি হেয়ালি করে বলে,

— বিশ্বাস না হলে তোমার বিবিজান হুজুরকে জিজ্ঞেস করেই দেখো?

কথাটা শেষ হতেই দু জনে হো হো করে হেসে ওঠে।

স্বপন আলাদা ঘর বেধেছিলো। সেখানে ছিলোও কিছু দিন। পরে তার বাবা-মা গিয়ে অনুনয় করে বলল,

— এতে মিয়া বাড়ির বদনাম হচ্ছে।

বুঝিয়ে শুনিয়ে ছেলে-বউকে আবার বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলো তারা। স্বপন বলল,

— সুমি যেতে না চাইলে আমি বাধ্য করতে পারব না। সে অধিকার ইসলাম আমাকে দেয় না। আমি আপনাদের সন্তান, আপনাদের সেবা গুরুত্বা কিছু করতে হলে সেটা

আমি করবো, সেটা আমার দায়িত্ব। আমার বউ এর উপর এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেয়। তবে যদি সে যেতে চায় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।

তার বাবা-মা দুজনেই কিরে-কসম করে বলল,

— বাড়ির দক্ষিন পাশে এবার তারা নিজের খরচে দু কামরা ঘর করে দেবেন। সেখানে গিয়ে ছেলে বউ বেশ আরামেই থাকতে পারবে। সুমি বলল,

— আমি যাব। তবে একটাই শর্ত, আমার উপর যদি কোনো অন্যায় করা হয় তবে আবারও চলে আসব।

তারপর থেকে মিয়া বাড়িতে বউ শাশুড়ি সুখে শান্তিতেই বসবাস করতে লাগল। সমাজের লোকজন অবশ্য বিনাটিকিটে যাত্রাপালা দেখতে না পেয়ে কিছুটা নাখোশ হয়েছিলো। আর সবই ঠিকঠাক ছিলো।

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

গবেষণা গ্রন্থঃ

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বালালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাক্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (‘হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!’ বইয়ের জবাব)
১৭. একটি অসম বিতর্কের সুষম সমাধান
১৮. সাহ্ সিজদা
১৯. কুরআন, হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে সহজ ফারায়েজ
২০. পারিবারিক ভারসাম্য

রিসালাহ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ)ঃ

২১. ছোটদের আক্বাইদ
২২. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
২৩. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২৪. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২৫. সংশয় নিরসন (জিহাদ সম্পর্কিত)

ইসলামী উপন্যাসঃ

২৬. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৭. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)

২৮. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৯. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
৩০. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
৩১. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
৩২. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩৩. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩৪. কুরানিক চশমা
৩৫. তওবা
৩৬. বিবিজান হুজুরের হারানো বিদ্যা

কবিতা গ্রন্থঃ

৩৭. কবিতায় জাহ্নাত (কবিতার ছন্দে জাহ্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
৩৮. কল্পনায় জাহ্নাত (কবিতার ছন্দে জাহ্নাতের জীবন সম্পর্কে কল্পনা)
৩৯. কবিতায় জাহ্নাম (কবিতার ছন্দে জাহ্নামের শাস্তির বিবরণ)
৪০. ভন্ড হুজুর (কবিতার ছন্দে নামধারী আলেমদের ভন্ডামীর বর্ণনা)

ভাষা শিক্ষাঃ

৪১. তাইসীরুল ক্বওয়্যিদ (আরবী গ্রামার)
৪২. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)